টিউনিসিয়ার ইতিহাস

ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদ

আবদুস সাত্তার আইনী

তিউনিসিয়ার ইতিহাস

(রাজনীতি ও অভ্যুত্থান–ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

তিউনিসিয়ার ইতিহাস

(রাজনীতি ও অভ্যুত্থান–ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

মূল
ড. রাগিব সারজানি

বাংলা রূপান্তর
আবদুস সাত্তার আইনী

মাকতাবাতুল হাসান

তিউনিসিয়ার ইতিহাস
(মূলগ্রন্থ : কিস্‌সাতু তিউনিস মিনাল বিদায়াতি ইলা সাওরাতি ২০১১)
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৮
সর্বশেষ সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মাকতাবাতুল হাসানের পক্ষে প্রকাশক মুহাম্মদ রাকিবুল হাসান খান কর্তৃক প্রকাশিত
ও শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র : মাদানীনগর মাদরাসা রোড, চিটাগাং রোড, নারায়ণগঞ্জ
✆ ০১৬৭৫৩৯৯১১৯
বাংলাবাজার শাখা : ৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

অনলাইন পরিবেশক
niyamahshop.com - rokomari.com - wafilife.com
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
ISBN : 978-984-8012-15-4

মূল্য : ২৪০/- টাকা মাত্র

Tunisiar Itihas
by Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail : rakib1203@gmail.com
Facebook/maktabatulhasan
www.maktabatulhasan.com

অর্পণ

আল্লাহর পথে দাওয়াতি কাফেলার উদ্দেশে...
আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ে তাদের শ্রম-ঘাম-ত্যাগ কবুল হোক...

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

এই পিডিএফ এর সূচিপত্রে নির্দিষ্ট টপিকে ক্লিক করলে ওই টপিকের পেজে নিয়ে যাবে ।আর Contents এ ক্লিক করলে সূচিপত্রে নিয়ে আসবে।

সূ চি প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের কথা	৯
অনুবাদকের কথা	১১
ইতিহাসের এক ঝলক	
ইসলামি বিজয়	১৮
তিউনিসিয়ার আধুনিক ইতিহাস	৩০
তিউনিসিয়ায় ফ্রান্সের দখলদারত্ব	
ফ্রান্সের দখলদারত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া	৩৫
তিউনিসিয়ায় ফরাসি দখলদারত্বের সাংস্কৃতিক প্রভাব দখলদার শাসনকালে সাংস্কৃতিক বাস্তবতা	৪০
তিউনিসিয়ায় প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা	
এসব স্বপ্ন ও অঙ্গীকার কি বাস্তবতার মুখ দেখেছিল?	৪৪
কে এই বুরগিবা?	৪৫
তিউনিসিয়া থেকে ইসলামকে বিলুপ্তকরণ	৪৭
হাবিব বুরগিবা ও ইসলামবিরোধী লড়াই	৪৯
ইসলামের হুকুম-আহকামের পরিবর্তন	৫৩
হিজাব যখন অপরাধ	৫৫
যাইনুল আবেদিন বিন আলি তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি	
শ্বেত বিপ্লব বা ৭ই নভেম্বরের বিপ্লব	৬৪
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি	৬৫
স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র	৬৬
তিউনিসিয়ায় ইসলামপন্থা	৬৮
তিউনিসিয়ার আন-নাহদা ইসলামি আন্দোলন	৬৯
আশির দশকের বিপর্যয়	৭১
প্রগতিশীল ইসলামপন্থীরা	৭৪
নব্বই দশকের বিপর্যয়	৭৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
অরাজকতার মুখে জাগরণ	
তিউনিসিয়ায় হিজাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কয়েকটি চিত্র	৮০
অরাজকতা ও ভাঙন	৮৩
স্বৈরাচারী শাসনের সমাপ্তি	৮৩
বিপ্লবের পটভূমি	৮৪
বিপ্লব!	
ঘটনার ঘনঘটা	৯৬
আমি আপনাদের বুঝেছি	১০২
বিন আলির পলায়ন	১০২
ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ	
মহাঘটনা	১০৯
প্রথম পয়েন্ট	১০৯
দ্বিতীয় পয়েন্ট	১১০
তৃতীয় পয়েন্ট	১১২
চতুর্থ পয়েন্ট	১১৬
পঞ্চম পয়েন্ট	১১৯
ষষ্ঠ পয়েন্ট	১২০
তিউনিসীয় জাতির বিপ্লবের রহস্য উন্মোচনে কতিপয় ব্যাখ্যা	১২০
ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্টে তিউনিসিয়ার অবস্থান কী	১২১
কিন্তু অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের অবস্থা কী?	১২২
সপ্তম পয়েন্ট	১২৫
অষ্টম পয়েন্ট	১২৮
নবম পয়েন্ট	১৩১
দশম পয়েন্ট	১৩৮
পরিসমাপ্তি	

Contents

লেখকের কথা

তিউনিসিয়ার বিপ্লব মুসলমানদের অনুভূতিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। আমাদের সময়ে এটি একটি অনন্য ঘটনা। যখন মুসলিম উম্মাহ তাগুত প্রেতাত্মাদের দ্বারা আক্রান্ত। তারা অধিকাংশ মুসলিম দেশ শাসন করছে। মুসলিম দেশগুলো থেকে স্বৈরাচারের শেকড় উপড়ে ফেলার জন্যই এই বিপ্লব। এ-স্বৈরতন্ত্রের বীজ ছিল জুলুম ও উৎপীড়ন এবং ফসল ছিল নৈরাজ্য ও অরাজকতা। তিউনিসিয়ার বিপ্লব ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রুদের জন্য একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। ...সময় তার প্রসার ঘটিয়েছে, গোপনীয় রাখেনি। তা নিয়ে গর্ব করেছে, তাকে অস্বীকার করেনি। ...তারপর কিছু দিন অতিবাহিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি দেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন—

﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾

"আমি মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এই দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই।"

তিউনিসিয়া এখন সকলের দৃষ্টি মনোযোগের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছে। তিউনিসিয়ার বিপ্লব নিয়ে তাত্ত্বিকগণ, বিশ্লেষকগণ, রাজনীতিবিদগণ, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন এবং প্রতিটি পয়েন্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের আরব বিশ্বে তাগুত শাসকদের বিরুদ্ধে এমন বিপ্লব আমরা খুব কমই দেখেছি। যদিও আমরা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এমন প্রতিরোধ অনেক দেখেছি।

এ-জন্য আমাদের কিছুটা সময় ও বিরতি প্রয়োজন যাতে আমরা এই মহাঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারি। আমি স্বাভাবিক রীতিতেই আমার গ্রন্থাবলি ও বক্তৃতাসমূহে যা উল্লেখ করে থাকি অর্থাৎ, ইতিহাসের পাতায় প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া আমাদের পক্ষে ঘটনার অনুধাবন ও বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত রীতিনীতি না বুঝে এই ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তা জানা যাবে আল্লাহর কিতাব থেকে, রাসুলের সুন্নাহ থেকে যেমন, আরও জানা যাবে ইতিহাসের পাঠ থেকে, অনুরূপ ঘটনাবলি ও তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করে, কাহিনির মূল ও মর্মে ফিরে গিয়ে এবং কুরআনুল কারিমের নিম্নবর্ণিত আয়াত বিশ্লেষণ করে—

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"এবং বৃত্তান্ত বিবৃত করো, যাতে তারা চিন্তা করে।"

এভাবেই এই বইটি লেখার চিন্তা আমার মাথায় এসেছে। বইটিতে মহান দেশ তিউনিসিয়ার শুরুর ইতিহাস রয়েছে, দেশটি ইতিহাসের নানান ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব ঘটনাবলির সাক্ষী হয়েছে তার বর্ণনা রয়েছে এবং শেষে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসের বিপ্লবের ঘটনাও বিবৃত হয়েছে। কয়েকটি ভাগে আমরা বিপ্লবের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি এবং একইসঙ্গে প্রিয় তিউনিসিয়ার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি। আল্লাহর নির্ধারিত রীতিনীতি ও সুন্নাহের জ্ঞানই আমার আলোচনা-পর্যালোচনার ভিত্তি।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করুন।

— ড. রাগিব সারজানি

Contents

অনুবাদকের কথা

রাগিব সারজানি এ-বইটি মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে রচনা করেছেন। তিউনিসিয়ার বিপ্লবের ফলাফল কী হতে পারে এবং অন্যান্য দেশে স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে কীভাবে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে পারে তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। বইটি লেখার ৮ বছর পর এখন দেখা যাচ্ছে যে, আরব বিশ্বের বিপ্লবের ফলাফল সম্পর্কে তিনি যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা প্রায় শতভাগ মিলে গেছে। তিনি নিজের দেশ মিসরে বিপ্লব আসন্ন বলে আশা করেছেন। কিন্তু তিনি আশঙ্কা করেছেন যে, এসব বিপ্লবের ফসল ইসলামি আন্দোলনের কর্মীরা ঘরে তুলতে পারবে না, পারলেও তা ধরে রাখতে পারবে না। মিসরে তো তা-ই ঘটেছে। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের ফলে স্বৈরাচারী একনায়ক হুসনি মুবারকের পতন ঘটেছে। জাতীয় নির্বাচনে ইসলামি আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ইখওয়ানুল মুসলিমের নেতা মুরসি প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেও এক বছরের বেশি তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারেননি। সামরিক জান্তা তাঁকে হটিয়ে ক্ষমতার মসনদ দখলে নিয়েছে এবং ইসলামি আন্দোলনের শত শত কর্মীকে হত্যা করেছে। লিবিয়াতে স্বৈরাচারী মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতন ঘটলেও ইসলামপন্থীদের ভাগ্যে সুফল আসেনি। সিরিয়ায় এখনো রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ চলছে; লাখ লাখ মানুষ নিহত ও উদ্বাস্তু হয়েছে।

রাগিব সারজানি বলেছেন, বিপ্লবের ফসল ঘরে তুলতে হলে এবং তা ধরে রাখতে হলে যথাযথ প্রস্তুতি প্রয়োজন। সে-প্রস্তুতি ইসলামপন্থীদের নেই। তিনি ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

বইটির একটি অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, স্বৈরাচারী শাসকেরা মুসলমানদের জাতিসত্তা ও পরিচয়কে ধ্বংস করতে চাইলে প্রথমে তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়। এতে সফল হলে তাদের সামনে পরবর্তী পথ সুগম হয়ে ওঠে। তারা ইসলামি নিদর্শনসমূহের ওপর আঘাত হানে।

লেখকের বক্তব্য ও সতর্কবাণী থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

আবদুস সাত্তার আইনী
ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
abdussattaraini@gmail.com

Contents

ইতিহাসের এক ঝলক

তিউনিসিয়া (তিউনিসীয় প্রজাতন্ত্র) আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরে জিব্রাল্টার প্রণালি ও সুয়েজ খালের মধ্যবর্তী স্থানে ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত রাষ্ট্র। তিউনিসিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে প্রজাতন্ত্রী লিবিয়া এবং পশ্চিমে রয়েছে আলজেরিয়া। রাজধানীর নাম তিউনিস। দেশটির আয়তন ১৬৩৬১০ বর্গ কিলোমিটার। তিউনিসিয়ার চল্লিশ ভাগ ভূমি মরু অঞ্চল; বাকি অংশ সমুদ্র-সংযুক্ত উর্বর সমভূমি। তিউনিসিয়া তার ইতিহাসজুড়ে কার্থেজে ফিনিসীয় জাতির যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিবাহিত করেছে। রোমান শাসনামল থেকে তা ইফ্রিকিয়া[১] ভূখণ্ড হিসেবে পরিচিতি পায়। সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানরা তিউনিসিয়া জয় করে এবং

---

[১] মধ্যযুগে আরবগণ রোমান সাম্রাজ্যের যে-আফ্রিকান ভূখণ্ড জয় করে নিয়েছিলেন তাকে তাঁরা ইফ্রিকিয়া বলতেন। তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া, ত্রিপোলি, কায়রাওয়ান ও কার্থেজ এর অন্তর্ভুক্ত। এসব দেশ বর্তমানে উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত। ইফ্রিকিয়ার শাসনব্যবস্থার একটি তালিকা দেওয়া হলো।

ইফ্রিকীয় আমিরাত বা উত্তর আফ্রিকায় আমিরের শাসন :

১.নিকুর আমিরাত, রিফ, বর্তমান মরক্কো, ৭১০-১০১৯

২.ইফ্রিকিয়া আমিরাত, আগলাবি ইফ্রিকিয়া, বর্তমান তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, সিসিলি, মরক্কো ও লিবিয়া, ৮০০-৯০৯

৩.তিউনিস আমিরাত, হাফসি ইফ্রিকিয়া, বর্তমান তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও লিবিয়া, ১২২৯-১৫৭৪

৪.জাব আমিরাত, বর্তমান আলজেরিয়া, আনুমানিক ১৪০০ (স্বল্পকাল স্থায়ী)

৫.তারারজা আমিরাত, বর্তমান মৌরিতানিয়া ১৬৪০-১৯১০ দশক

৬.হারার আমিরাত, বর্তমান ইথিওপিয়া, ১৬৪৭-১৮৮৭

৭.সিরেনাইকা আমিরাত, বর্তমান লিবিয়া, ১৯৪৯-১৯৫১

আমিরাত প্রতিষ্ঠার পূর্বে এ-সকল ভূখণ্ড ছিল রোমান সাম্রাজ্যের আফ্রিকান অংশ।

কায়রাওয়ান[২] নগরীর গোড়াপত্তন করে। এখনও পর্যন্ত এটি তিউনিসিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর।

তিউনিসিয়া প্রাচীনকালে তারশিশ নামে পরিচিত ছিল। মুসলমানরা সেখানে আবাসস্থল ও ভবনাদি নির্মাণ এবং উদ্যান ও বাগান তৈরির পর তার নাম হয়ে গেল তিউনিস। এটি একটি বার্বার শব্দ; অর্থ হলো বারযাখ বা মধ্যবর্তী স্থান। তিউনিসিয়ার ভূমিতে বহু সভ্যতা ধারাবাহিকভাবে সময় যাপন করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বার্বার সভ্যতা, ফিনিসীয় সভ্যতা, রোমান সভ্যতা ও আরব ইসলামি সভ্যতা। প্রতিটি সভ্যতাই তাদের নাগরিক জীবনের অবশিষ্টাংশ ও উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক নিদর্শন রেখে গিয়েছে। প্রাপ্ত প্রাথমিক ঐতিহাসিক নথি ও নিদর্শন ইঙ্গিত করে যে, প্রাচীনকালে তিউনিসিয়ার অভ্যন্তরীণ অঞ্চলগুলো বার্বার জাতি ও গোত্রসমূহের আবাসভূমি ছিল। তিউনিসিয়ার উপকূলীয় ভূমিতে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল; কার্থেজ নগরীতে যে-সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটেছিল তার জীবৎকাল ছিল খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। ফিনিসীয় জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন সুর[৩] নগরী থেকে। সুর নগরী বর্তমান সময়ে লেবাননে অবস্থিত।

ফিনিসীয়রা ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভ্রমণের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কার্থেজের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমাগত বিস্তৃতি লাভ করছিল; অবশেষে তা ভূমধ্যসাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে ব্যবসায়ী ও অভিযাত্রী বণিকেরা ইফ্রিকিয়ার উপকূলে এমনকি সিয়েরা লিওন পর্যন্ত পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। কার্থেজ তার বিস্তৃত বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে বিপুল ঐশ্বর্যরাশিতে টইটম্বুর হয়ে উঠেছিল। এই নগরীর একটি পরামর্শসভা ও নাগরিক সমিতি ছিল। পরবর্তী সময়ে কার্থেজের যাবতীয় কর্তৃত্ব বিচারকমণ্ডলী ও বাৎসরিক নির্বাচনে মনোনীত দু-জন শাসকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। এই দু-জন শাসকের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিবাদ এবং তাদের রাজনৈতিক সংঘাত কার্থেজকে দুর্বলতা ও বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দেয়।

---

[২] ভিন্ন উচ্চারণ : কায়রওয়ান, কায়রোয়ান।

[৩] Tyre, Lebanon.

কার্থেজ খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সার্ডিনিয়া, মাল্টা ও বালিয়ারিক দ্বীপসমূহের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল; একইভাবে সিসিলির ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। রোমান নেতৃবৃন্দ ও কয়েকটি গ্রিক নগরীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে কার্থেজ এ-আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু ৪৮০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে হিমেরা যুদ্ধে[৪] পরাজয়বরণের কারণে কার্থেজ সিসিলির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে কার্থেজ ভূমধ্য সাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। ফলে রোমানরা কার্থেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং একে তাদের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ হয়; এগুলো পিউনিক যুদ্ধ[৫] হিসেবে পরিচিত। এ-যুদ্ধগুলোর শুরুতেই কার্থেজ সিসিলিকে হাতছাড়া করে। অব্যবহিতের পরেই কার্থেজকে তার শক্তিবলয়গুলোর অভ্যন্তরে মারাত্মক ধরনের ভাগ-

---

[৪] Battle of Himera (480 BC).

[৫] প্রাচীন রোম ও কার্থেজের মধ্যে সংঘটিত তিনটি যুদ্ধকে একত্রে পিউনিক যুদ্ধ বলা হয়। পিউনিক কথাটি লাতিন পুনিকি শব্দ থেকে এসেছে। লাতিন ঐতিহাসিকেরা কার্থেজের অধিবাসীদের পুনিকি অর্থাৎ ফিনিসীয়দের উত্তরসূরি বলে ডাকতেন। পিউনিক যুদ্ধগুলোর মূল কারণ ছিল বিদ্যমান কার্থেজীয় সাম্রাজ্য এবং সম্প্রসারমান রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অভিলাষের সংঘর্ষ (clash of interests)। প্রথমে রোমানেরা সিসিলি দ্বীপ দখলের মাধ্যমে তাদের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সিসিলির একাংশ ছিল কার্থেজীয়দের দখলে।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ যখন শুরু হয়, কার্থেজ ছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান শক্তি। তাদের ছিল ভূমধ্যসাগরের উপকূলজুড়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য। অন্যদিকে রোম ছিল ইতালীয় উপদ্বীপে দ্রুত উন্নয়নশীল শক্তি। দুই পক্ষের লক্ষ লক্ষ সৈন্যের মৃত্যুর পর যখন তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের অবসান হয়, রোম কার্থেজীয় সাম্রাজ্যের পূর্ণদখল নেয় এবং কার্থেজ শহর ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের প্রধানতম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। একই সময়ে রোম পূর্ব ভূমধ্যসাগরের ম্যাসিডোনীয় যুদ্ধ ও রোমান-সিরীয় যুদ্ধে বিজয় লাভ করে এবং প্রাচীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শহর হিসেবে আবির্ভূত হয়। কার্থেজের পতন ছিল ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকাল। এর ফলে আধুনিক বিশ্বে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উত্তরণ আফ্রিকার বদলে ইউরোপের হাত ধরে সম্পন্ন হয়।

বাটোয়ারা করতে হয়। তার কারণ ছিল এই যে, ভাড়াটে সৈনিকদের[৬] মধ্যে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, অথচ কার্থেজ ভাড়াটে সৈনিকদের ওপরই বেশি নির্ভরশীল ছিল। হেমিলকার বার্সা (Hamilcar Barca)[৭] স্পেনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। ফলে তিনি বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হন এবং তার দেশকে সিসিলির ওপর কর্তৃত্ব হারানো থেকে রক্ষা করেন। স্পেনের ওপর কার্থেজের আধিপত্য বিস্তার আবারও রোমানদের শঙ্কিত করে তোলে এবং দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে (খ্রিষ্টপূর্ব ২১৮-২০২) অবতীর্ণ হতে প্ররোচিত করে। বিখ্যাত কার্থেজীয় সেনাপতি হানিবাল বার্সা (Hannibal Barca)[৮] ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ ও বিচক্ষণ। কিন্তু কার্থেজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ায় তাঁর কাছে সাহায্য পৌঁছায়নি। ফলে কার্থেজের শক্তিগুলো বিপর্যয়কর পরাজয়ের মুখোমুখি হয়। এই যুদ্ধে কার্থেজ তার প্রায় সব যুদ্ধজাহাজ ও ইফ্রিকিয়ার বাইরের সাম্রাজ্যকে হারায় এবং এ-কারণে বিপুল অর্থদণ্ডের বিনিময়ে রোমানদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়।

তারপরও কার্থেজের ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত থাকে এবং বিস্তৃতি লাভ করে। আবারও তার শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় ও সংহত হয়। ভীতি ও আশঙ্কা রোমকে পুনরায় তাড়িয়ে বেড়াতে শুরু করে, ফলে তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ (১৪৬-১৪৯ খ্রিষ্টপূর্ব) সংঘটিত হয়। কার্থেজকে সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দিয়ে এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। কার্থেজ নগরীও পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সম্রাট জুলিয়াস সিজার কার্থেজের পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং নগরীটির ল্যাটিন নাম দেন Colonia Julia Carthago অর্থাৎ, কার্থেজের জুলিয়াসীয় উপনিবেশ। কিন্তু সম্রাট অগাস্টাস জুলিয়াস সিজারের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত নগরীর নির্মাণকাজ সরকারিভাবে শুরু হয়নি।

এলাকাটি দ্রুত ফলে ও ফসলে এবং শস্য ও শ্যামলিমায় ভরে ওঠে। এমনকি রোমান সাম্রাজ্যের ইফ্রিকিয়া অংশ কৃষি-উৎপাদিত পণ্যের

---

[৬] বাহিনীর নিয়মিত সৈনিক না; বরং ভাড়া ও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যুদ্ধ করে থাকে—এদেরকে মার্সেনারি সৈনিক বলা হয়।

[৭] কার্থেজীয় সেনাপতি (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৫-২২৮)।

[৮] খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৭-১৮৩। জেনারেল কমান্ডার-ইন-চিফ অফ কার্থেজিয়ান আর্মি।

প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে গম ও যাইতুন তেল। রোমানদের নির্মিত শহরপুঞ্জের ঘন জালে এলাকাটি ঢেকে যায়। এসব শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিস্ময়ের উদ্রেক করে, মানুষকে অভিভূত করে।

ইফ্রিকিয়া (তিউনিসিয়া) ছয় শতাব্দীব্যাপী অনন্য ঐশ্বর্যশালী আফ্রিকায় রোমান সভ্যতার আবাসভূমি ছিল। কারণ তিউনিসিয়া ছিল প্রাচীন বিশ্বের সংযোগস্থল; সব পথ এখানে এসে মিশেছিল। তিউনিসিয়ায় ঔপনিবেশিক যুগে স্থানীয় দেব-দেবীর আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা ছিল রোমান দেব-দেবীর প্রতিদ্বন্দ্বী। কার্থেজীয়দের দেবতা বাআল হামুন[৯] ও দেবী তানিত[১০]-এর উপসনার ধারাবাহিকতায় কিছু দেব-দেবীর পূজাও করা হতো। যেমন : রোমান দেবতা স্যাটার্ন[১১] ও রোমান দেবী জুনো[১২]। এ-ইফ্রিকিয়া এলাকাটি ফলে ও ফসলে ভরপুর হওয়ায় এবং প্রাচীন বিশ্বের সংযোগস্থল হওয়ার কারণে শুরুর দিকেই এখানে ইহুদিরা এসেছিল এবং বাসস্থান ও সমাজ নির্মাণ করেছিল।

এরপর খ্রিষ্টধর্মেরও প্রসার ঘটে। শুরুতে তা ওখানকার অধিবাসীদের বড় কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হয়নি। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আগ পর্যন্ত ওখানে নতুন ধর্মের জন্য শেকড় বিস্তার করা সম্ভব হয়নি। পশ্চিমে কার্থেজ খ্রিষ্টধর্মের গুরুত্বপূর্ণ আত্মিক রাজধানী হয়ে ওঠে এবং এ-অবস্থাই অব্যাহত থাকে। অবশেষে মুসলিম সেনাপতি হাসসান বিন নু'মান ৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে (৭৯ হিজরিতে) ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কার্থেজ জয় করতে সক্ষম হন।

---

[৯] আবহাওয়া ও শস্য-উর্বরতার দেবতা। একে দেবতাদের দেবতাও বলা হয়।

[১০] মাতৃত্ব, উর্বরতা, বর্ধন ও জীবনৈশ্বর্যের দেবী। একে বাআল হামুনের পাশে রাখা হতো।

[১১] সম্পদ, কৃষি, স্বাধীনতা ও সময়ের দেবতা।

[১২] বিবাহ ও সন্তানের দেবী।

Contents

ইসলামি বিজয়

ইফ্রিকিয়া অর্থাৎ বর্তমানকালের তিউনিসিয়া খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে বাইজানটিয়ানদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। পূর্ব জার্মানির আদিবাসী গোষ্ঠী ভ্যান্ডালদের হিসেব অনুযায়ী বাইজানটিয়ান সম্রাট জাস্টিনিয়ান ৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিসিয়াকে তাঁর কর্তৃতাধীন এনেছিলেন। বাইজানটিয়ান শাসন কিছু এলাকাতে সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিমের অন্যান্য এলাকা রাজনৈতিকভাবে একতাবদ্ধ ছিল না। বার্বার জাতির গোত্রগুলো জোটবদ্ধ এসব এলাকা শাসন করত।

উসমান বিন আফফান (রা.)-এর খিলাফতকালে প্রথমদিকের অনুসন্ধানী অভিযানগুলোর সূচনা হয়। তিনি ইফ্রিকিয়া জয়ের উদ্দেশ্যে মদিনায় লোকদের সমবেত করেছিলেন। অভিযানের নেতৃত্বে ভূষিত করেছিলেন তৎকালীন মিসরের গভর্নর আবদুল্লাহ বিন আবু সার্হকে[১৩]। এই অভিযানের নাম ছিল আবদুল্লাহদের অভিযান বা গাযওয়াতুল আবাদিলাহ[১৪]। এই যুদ্ধে ইসলামি-আরব সেনাবাহিনী ২৭ হিজরিতে/৬৪৭

---

[১৩] আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সার্হ। হিজরতের ২৩ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। উসমান বিন আফফান (রা.)-এর দুধভাই। তাঁর খিলাফতকালে মিসরের গভর্নর। গভর্নর থাকাকালে (৬৪৬-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) একটি শক্তিশালী মিসরীয়-আরব নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। আফ্রিকা-বিজেতা। যাত-আস-সাওয়ারি যুদ্ধে (Battle of the Masts/معركة ذات الصواري) রোমান শক্তিকে পরাজিত করেন; নৌযুদ্ধে বাইজানটিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় কনস্ট্যান্সের বাহিনীকে পর্যদুস্ত করে ছাড়েন। মিসর বিজয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সেনাবাহিনীর দক্ষিণ ব্যূহের সেনাপতি ছিলেন। তিনি মুতার যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী ওয়াহাব বিন সা'দ (রা.)-এর ভাই। ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ত্রিপলি দখল করেন এবং লিবিয়াকে ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

[১৪] উসমান বিন আফফান (রা.)-এর খিলাফতকালে এই যুদ্ধে মুসলমানগণ স্বেতলা বা সুফেতুলা (Sbeitla or Sufetula) শহরটি জয় করেছিলেন। বর্তমানে শহরটি উত্তর-কেন্দ্রীয় তিউনিসিয়ায় অবস্থিত। এটি সুফেতুলা যুদ্ধ (Battle of Sufetula/معركة سبيطلة) নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে রোমান সেনাবাহিনী চরমভাবে পরাজিত হয়েছিল। রোমান সেনাবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন গ্রেগরি দ্য পার্টিশিয়ান (Gregory the Patrician) এবং তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লাখেরও বেশি। তিনি মুসলমানদের হাতে নিহত হন। আবদুল্লাহ বিন সা'দ বিন আবু সার্হ (রা.) শত্রুপক্ষের দুর্গবাসী ও

খ্রিষ্টাব্দে গ্রেগরির নেতৃত্বাধীন বাইজানটিয়ান বাহিনীকে উকুবাহ নামক স্থানে পরাজিত করে। এরপর ভয়ংকর ফেতনা (আল-ফিতনাতুল কুবরা, উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড ও তৎপরবর্তী ফেতনা) শেষ হওয়া পর্যন্ত আফ্রিকায় অনুসন্ধানী অভিযান মুলতবি থাকে।

মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.)-এর খিলাফতকালে মুআবিয়া বিন হুদাইজ আস-সাকুনী দুটি অভিযান পরিচালনা করেন; একটি ৪১ হিজরিতে/৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে এবং অপরটি ৪৫ হিজরিতে/৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। অভিযান দুটির মধ্য দিয়ে মুসলমানরা কারূন আল-হালফায়া পাহাড়ে অবস্থান নিতে সক্ষম হয়। কায়রাওয়ানের নিকটবর্তী সুসা ও জালাওলার উদ্দেশে কয়েকটি ছোট অভিযানও প্রেরণ করেন। কিন্তু ইবনে হুদাইজ ওই এলাকাগুলোতে কোনো সুরক্ষা-বাহিনী নিযুক্ত না করেই মিসরে ফিরে আসেন।

খলিফা মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.) ৫০ হিজরিতে/৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে উকবা বিন নাফে আল-ফিহরিকে ইফ্রিকিয়ায় নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি তখন লিবিয়ার বারকা[১৫]য় ছিলেন। তিনি বাইজানটিয়ান ও বার্বারদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খলিফার নির্দেশে তিনি মরুভূমির মধ্য ইফ্রিকিয়ায় পৌঁছে গেলেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন ছিল ১০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী। তিনি কায়রাওয়ান দখল করে নেন এবং ওখানে সেনাশিবির স্থাপন করেন। এই সেনাশিবিরে শহরের সব ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল। চার বছর ধরে কায়রাওয়ান নগরীটি নির্মাণের কাজ চলল।[১৬] এই সময়ের মধ্যে তিনি বার্বার জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম প্রচার ও ইসলামি হুকুমতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কয়েকটি সেনাদল প্রেরণ

মাদায়িনবাসীদের সঙ্গে এক লাখ রিত্‌ল স্বর্ণের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি করেন। এ-যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ বিন সা'দ ছাড়া আরও ছয়জন সেনাপতি ছিলেন, তাঁদেরও নাম ছিল আবদুল্লাহ। তাঁরা হলেন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.), আবদুল্লাহ বিন জা'ফর (রা.), আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.)। এ-কারণে এই যুদ্ধকে আবদুল্লাহদের যুদ্ধ বলা হয়।

[১৫] ইংরেজি বা লাতিন ভাষায় Cyrenaica বলে।

[১৬] উকবা বিন নাফেকে কায়রাওয়ান নগরীর নির্মাতা বলা হয়।

করেন। কিন্তু ৫৫ হিজরিতে/৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে উকবা বিন নাফেকে বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর স্থলে আবুল মুহাজির দিনারকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি বুরনুসি[১৭] বার্বারদের নেতা কুসাইলা[১৮] কে পরাজিত করতে সক্ষম হন। বার্বাররা ইফ্রিকিয়ায় ইসলামি আরবের উপস্থিতির ঘোর বিরোধী ছিল। পরে আবুল মুহাজির দিনার কুসাইলার সঙ্গে শান্তিচুক্তি ও ঐক্যচুক্তি করেন। পরবর্তী সময়ে ৬২ হিজরিতে/৬৮২ খ্রিষ্টাব্দে আবুল মুহাজিরকে বরখাস্ত করা হয় এবং তাঁর স্থলে উকবা বিন নাফেকে পুনরায় পাঠানো হয়। উকবা বিন নাফে (তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে কায়রাওয়ান থেকে উত্তর ইফ্রিকিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যান এবং) পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার পথে রোমান ও বার্বারদের যৌথ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হন। একটি ছোট সেনাদল নিয়ে তিনি কায়রাওয়ানে ফিরে আসার জন্য রওনা হন। ফিরে আসার পথে বাসকারা[১৯]য় কুসাইলা ও তার রোমান মিত্রদের গুপ্ত আক্রমণের শিকার হন। তাহুদা নামক স্থানে উকবা বিন নাফে ও তাঁর সেনাদলের সবাই শত্রুদের হাতে নিহত হন। এটা ৬২ হিজরিতে/৬৮২ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। এই ঘটনার পরিণাম হয় অত্যন্ত শোচনীয় : মুসলমানরা পরাজিত হয় এবং তাদেরকে কায়রাওয়ান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। (বর্তমান যে-তিউনিসিয়া তার কোনো অংশেই মুসলমানদের উপস্থিতি থাকে না।) কুসাইলা কায়রাওয়ানে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৬৯ হিজরিতে/৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় থাকে।

---

[১৭] কুসাইলা (Caecilius) : বার্বার ভাষায় এই শব্দের অর্থ চিতা। ৭ শতকে আলতাভা (আলতাওয়া) রাজ্যের বার্বার খ্রিষ্টানদের রাজা। আফ্রিকায় অভিযাত্রী মুসলমানদের বিরুদ্ধে ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে শক্তিশালী বার্বার সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য তিনি পরিচিত। বাসকারা যুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী মুসলমানদের পরাজিত করে এবং মুসলিম সেনাপতি উকবা বিন নাফে নিহত হন। কুসাইলা ৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে নিহত হন।

[১৮] বুরনুস (البرنس أو البرنوس)-এর বহুবচন বারানিস (بَرَانِسُ)। শব্দটি বার্বার ভাষা থেকে আরবি ভাষায় আত্তীকৃত। পশমের তৈরি আলখাল্লা জাতীয় দীর্ঘ মোটা পোশাক। বার্বার জাতিগোষ্ঠী এই পোশাক পরিধান করত বলে তাদেরকে উপর্যুক্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে।

[১৯] বর্তমানে আলজেরিয়ার একটি শহর।

একইভাবে রোমানরাও ইফ্রিকিয়া ও যাব অঞ্চলগুলোতে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনামলে যুহাইর বিন কায়স আল-বালাবিকে বার্বার ও রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করার জন্য পাঠানো হয়। তিনি কায়রাওয়ান পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন এবং ৬৯ হিজরিতে/৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কুসাইলা নিহত হয়। রোমানরা ৭১ হিজরিতে/৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য লিবিয়ার বারকায় একটি সামুদ্রিক নৌবহর প্রেরণ করে। তাদের মোকাবিলা করতে গিয়ে যুহাইর আল-বালাবি শাহাদাতবরণ করেন।

তারপর খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান নতুন করে হাসসান বিন নুমান আল-গাসসানি[২০]র নেতৃত্বে ৪০ হাজার যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী

---

[২০] উত্তর আফ্রিকায় উমাইয়া সেনাবাহিনীর আমির (সেনাপতি)। ইফ্রিকিয়ায় মুসলমানদের অধিকাংশ বিজয়ে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সিরিয়া মুসলমান কর্তৃক বিজিত হলে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কুরআন হিফজ করেন, হাদিসে নববি মুখস্থ করেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে হাদিসও বর্ণনা করেছেন। তাঁর কতিপয় বৈশিষ্ট্য :

১.বনু উমাইয়ার শাসনামলে সিরিয়া থেকে তিনিই প্রথম ইফ্রিকিয়ায় প্রবেশ করেন।

২.মুআবিয়া (রা.) তাঁকে ইফ্রিকিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তাঁকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন।

৩.ইফ্রিকিয়ায় বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি হলে আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তাঁকে ওখানে এবং বলেন, 'আমি ইফ্রিকিয়ার জন্য হাসসান বিন নুমান আল-গাসসানি ব্যতীত অন্যকাউকে যথেষ্ট মনে করি না।

৪.তাঁর সেনাবাহিনীর সদস্যসংখ্যা ৪০ হাজারে পৌঁছেছিল। এর মতো বিশাল সেনাবাহিনী আর কখনো ইফ্রিকিয়ায় প্রবেশ করেনি।

৫.তিনি স্পেনের কারতাজানা জয় করেন এবং 'বি'রুল কাহিনা' যুদ্ধে বার্বারদের সম্রাজ্ঞী আল-কাহিনাকে পরাজিত করেন।

৬.তিনি মধ্য-মাগরিবে মুসলমানদের ঘাঁটি সৃষ্টি করার জন্য তিউনিস নগরী আবাদ করেন।

৭.তাঁর সামনে থেকে রোমান সেনাবাহিনী ও তাদের মিত্ররা পালিয়ে যায় এবং সিসিলি ও স্পেনে গিয়ে আশ্রয় নেই।

৮.তিনি কায়রাওয়ানে অবস্থান করে নতুনভাবে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সরকারি অফিস-আদালত প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রেরণ করেন। ৭৫ হিজরিতে/৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে গোটা মাগরিবে[২১]র পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। তিনি ৭৬ হিজরিতে/৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে কার্থেজে প্রবেশ করতে সক্ষম হন এবং ওখান থেকে রোমানদের বিতাড়িত করেন।

৯.তিউনিসিয়ায় জামে আয-যাইতুনা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন।

১০.মাগরিবে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন।

[২১] মধ্যযুগে আরব ইতিহাসবেত্তাগণ মাগরিব শব্দটিকে আফ্রিকার তিনটি ভৌগলিক অংশকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করতেন। ১. আল-মাগরিব আল-আদনা (ইফ্রিকিয়া ও তিউনিসিয়া), ২. আল-মাগরিব আল-আওসাত (বর্তমানে আলজেরিয়া), ৩. আল-মাগরিব আল-আকসা (বর্তমানে মরক্কো)। বর্তমানে মাগরিব কথাটি দিয়ে মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার সমগ্র অঞ্চলকে বোঝানো হয়; ব্যাপকতর অর্থে লিবিয়া ও মৌরিতানিয়াকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতীতে মাগরিব বলতে অবশ্য দেশ তিনটির যেসব অংশ সুউচ্চ অ্যাটলাস পর্বতমালার উত্তরে ও ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ছিল সেগুলোকে বোঝানো হতো। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ স্পেন, পর্তুগাল, সিসিলি দ্বীপ এবং মাল্টা দ্বীপপুঞ্জকেও মাগরিবের অন্তর্ভুক্ত করেন। মাল্টা দ্বীপপুঞ্জে আজও আরবি ভাষার একটি মাগরিবীয় উপভাষা প্রধান ভাষা হিসেবে প্রচলিত। অ্যাটলাস পর্বতমালা এবং সাহারা মরুভূমির কারণে মাগরিব অঞ্চলটি আফ্রিকার অবশিষ্ট অংশ থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন। জলবায়ু, ভূমিরূপ, অর্থনীতি ও ঐতিহাসিক দিক থেকে এটি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সাথেই বেশি জড়িত।

৭০০ শতকের শুরুর দিকে মুসলমানগণ বাইজানটিয়ান শহর কার্থেজ (বর্তমান তিউনিসিয়াতে অবস্থিত) এবং ৭১১ সাল নাগাদ স্থানীয় বার্বার জাতির লোকদের বাধা পেরিয়ে মরক্কো পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। এসময় বার্বারদেরকে ইসলামে দীক্ষিত করা হয় এবং আরব সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। আরবরা মিশরের পশ্চিমের এই অঞ্চলটিকে মাগরিব ডাকা শুরু করে। আরবি ভাষায় মাগরিব শব্দটির অর্থ 'সূর্যের অস্তস্থল' বা 'পশ্চিম দিক'। মাগরিব অঞ্চলটি ৬৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮ম শতকের কিছুকাল পর্যন্ত একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে বিরাজমান ছিল। এরপর আবার আল-মুহাদ (আল-মুওয়াহ্হিদুন) শাসনের সময় (১১৫৯-১২২৯) অঞ্চলটি আবার একত্র হয়। এর বহু পরে বিংশ শতাব্দীতে এসে ১৯৮৯ সালে উত্তর আফ্রিকার আরব রাষ্ট্রগুলো 'আরব মাগরিব ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠা করে। মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া ও মৌরিতানিয়া এই জোটের সদস্যরাষ্ট্র। লিবিয়ার নেতা মুয়াম্মার আল-গাদ্দাফি এ-জোটকে একটি আরব মহারাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করেছিলেন, যেখানে সদস্য দেশগুলো একটি সাধারণ বাজারের আওতায় আসার কথা। কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ইউনিয়নের যৌথ লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করে।

হাসসান বিন নুমান বার্বারদের মোকাবিলা করার তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করেন। তখন বার্বারদের নেতৃত্বে ছিলেন কাহিনা দিহয়া বিনতে সাবেত বিন তুফয়ান। তিনি ছিলেন জারাওয়া গোত্রের নারী। তাঁর উপাধি ছিল মালিকাতুল আওরাস বা আওরাস (পর্বতমালা)-এর[২২] রানি। কিন্তু মুসলমানগণ আওরাস পর্বতমালার আযারি উপত্যকার যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। ফলে হাসসান বিন নুমানকে তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে কাবেসের দিকে ও সেখানে বারকার দিকে পিছু হটতে হয়। এই সময়ের মধ্যে কাহিনা ইফ্রিকিয়ার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। ...কিন্তু হাসসান বিন নুমান ৮২ হিজরিতে/৭০১ খ্রিষ্টাব্দে বার্বারদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম হন এবং তিনি কাহিনাকে হত্যা করেন। তারপর নতুনভাবে কায়রাওয়ানে ফিরে আসেন এবং ইফ্রিকিয়ার ওপর চূড়ান্ত আধিপত্য বিস্তারের প্রস্তুতি নেন।

হাসসান বিন নুমান বিজিত একালাগুলো সুশৃঙ্খল করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বার্বারদেরকে একটি শৃঙ্খলিত অবকাঠামোরূপে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে ইসলামের বলয়ে আরবদের সঙ্গে বার্বারদেরকে সংশ্লেষ করতে সহজ হয়। কিন্তু খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক হাসসান বিন নুমানকে বরখাস্ত করেন এবং তাঁর স্থলে মুসা বিন নুসাইরকে নিযুক্ত করেন। মুসা বিন নুসাইর কায়রাওয়ানকে তাঁর রাজধানী ঘোষণা করেন। ৮৬ হিজরির/৭০৫ খ্রিষ্টাব্দের পর ইফ্রিকিয়ার দেশগুলো মিসর থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন শাসনে যুক্ত হয়। ইফ্রিকিয়ার অবশিষ্ট এলাকা ও স্পেনের দিকে মুসলমানদের ছড়িয়ে পড়ার জন্য কায়রাওয়ান ছিল মূল ঘাঁটি।

কার্থেজ পুনরায় তার দাপট ও ঐশ্বর্য ফিরে পায়নি; বরং তা তিউনিসিয়ার নিকটবর্তী সমুদ্রবন্দরে পরিণত হয়। এরপর থেকে তা ছিল সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালির দিকে অভিযান প্রেরণের কেন্দ্র। মুসলমানগণ সমুদ্র-উপকূলীয় এলাকাগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করে ক্ষান্ত থাকেননি; বরং তাঁরা স্থলভাগের দিকে এগিয়ে গেলে এবং বার্বার জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁদের আকিদা ও বিশ্বাসের প্রচার-প্রসার ঘটালেন। ওই সময় থেকে

---

[২২] Aurès Mountains

মুসলমানদের পরবর্তী বিজয়সমূহে বার্বাররাই ছিল অভিযানের পুরোভাগে। বিশেষ করে স্পেনে তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে মুসলমানগণ বিজয় অর্জন করেছিলেন।

কায়রাওয়ান নগরীতে ইসলামের কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। কিন্তু ইসলামের লালনস্থল ও ইসলামি শাসনের কেন্দ্র প্রাচ্য থেকে ইফ্রিকিয়ার দূরত্ব ছিল বেশি; ফলে ওখানে নানা ধরনের ইসলামি উপদলের (ফেরকা) উদ্ভব ঘটেছিল, যারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্গত ছিল না। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো খারেজি ফেরকা ও তাদের চিন্তাধারা। তা সত্ত্বেও এই কালপর্ব আরব গোত্রসমূহের প্রতিনিধিদলের তিউনিসিয়া গমন ও সেখানে তাদের অবস্থানের ফলে নগরায়ণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার বড়-রকম উৎকর্ষের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

কায়রাওয়ান ১৩২ হিজরি/৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উমাইয়া সাম্রাজ্যের ও পরে আব্বাসীয় অনুগামী ইফ্রিকিয়া রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে থাকে। এই সময়ের মধ্যে এই এলাকা স্বাধীন শাসন লাভ করেনি। ১৮৪ হিজরিতে/৮০০ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হারুনুর রশিদের সিদ্ধান্তক্রমে আগলাবি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইবরাহিম ইবনুল আগলাবে[২৩]র নেতৃত্বে ইফ্রিকিয়ায় স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বতন্ত্র শাসনব্যবস্থার দ্বারা ইবরাহিম ইবনুল আগলাব যা চেয়েছিলেন তা হলো পশ্চিম ইফ্রিকিয়ায় ক্রমবর্ধমান খণ্ডরাষ্ট্রগুলোর সামনে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা। আগলাবি রাজবংশের শাসনব্যবস্থা এক শ বছর পর্যন্ত টিকে ছিল। আগলাবি রাজবংশের শাসনকালে সাংস্কৃতিক জীবনে বিপুল উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং কায়রাওয়ান আলোকায়নের (Enlightenment) কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই কালপর্ব নিজেই সাক্ষী রয়েছে যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণের মোকাবিলার জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করা হয়েছে। নৌবাহিনী গঠনের অব্যবহিত

---

[২৩] ইবরাহিম ইবনুল আগলাব (১৪০-১৯৬ হিজরি, ৭৫৭-৮১২ খ্রিষ্টাব্দ) : ইফ্রিকিয়া অঞ্চলে আগলাবি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তারা আব্বাসি খিলাফতের অনুগামী ছিল।

পরেই এ-বাহিনীর সাহায্যে আসাদ ইবনুল ফুরাত[২৪] সিসিল দ্বীপ জয় করতে সক্ষম হন।

২৯৬ হিজরিতে/৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কো অঞ্চলে (আল-মাগরিব) উবায়দুল্লাহ আল-মাহদির আবির্ভাব ঘটে। তিনি উবায়দিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। (মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে একে ফাতেমি সাম্রাজ্য বলা হয়।) এটি ছিল নিকৃষ্ট সাম্রাজ্য যা শিয়াদের ইসমাইলি মতাদর্শ আঁকড়ে ধরেছিল। উত্তর ইফ্রিকিয়ায় উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে এবং তিউনিসিয়া পর্যন্ত তাদের আধিপত্য বিস্তৃতি লাভ করে। এমনকি তারা আগলাবি রাজবংশের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে আগলাবি শক্তিসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের/২৯৬ হিজরির ২০ রবিউস সানি রোজ বৃহস্পতিবার উবায়দুল্লাহ আল-মাহদী তিউনিসিয়ার রাকাদা[২৫] নগরীতে প্রবেশ করেন। তার আগেই রাকাদা থেকে আগলাবি শাসক তৃতীয় যিয়াদাতুল্লাহকে উৎখাত করা হয়েছিল। উবায়দুল্লাহ রাকাদা নগরী থেকে তিউনিসিয়ায় উবায়দি শাসনের গোড়াপত্তন করেন।

তিউনিসিয়ায় উবায়দি শাসকদের শাসন ৬৪ বছর পর্যন্ত টিকে থাকে। ৩৫৮ হিজরিতে/৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে উবায়দি শাসকগণ মিসর দখল করে নিতে সক্ষম হন। ৩৬১ হিজরিতে/৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁরা তাঁদের রাজধানী মিসরে স্থানান্তরিত করেন।

উবায়দি শাসকগণ মিসরে চলে যাওয়ার সময় ইফ্রিকিয়ায় বার্বার বংশোদ্ভূত একজন আমিরকে নিযুক্ত করেন। তাঁর নাম ছিল বুলুগিন বিন যিরি বিন মানাদ বিন আস-সানহাজি[২৬]। বুলুগিন দেশের সীমান্তে ক্রমবর্ধমান গোত্রীয়

---

[২৪] আবু আবদুল্লাহ আসাদ ইবনুল ফুরাত বিন সিনান (৭৫৯-৮২৮ খ্রিষ্টাব্দ) : মালিস বিন আনাস (রহ.)-এর ছাত্র এবং কায়রাওয়ানের কাজি।

[২৫] আগলাবি রাজবংশের দ্বিতীয় রাজধানী। কায়রাওয়ান থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

[২৬] পুরো নাম : আবুল ফুতুহ সাইফুদ্দাওলা বুলুগিন বিন যিরি বিন মানাদ আস-সানহাজি (أبو الفتوح سيف الدولة بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي) : بلكين বা بلقين শব্দের উচ্চারণ সাধারণত 'বুলুগিন' (Buluggin) করা হয়। যিরি রাজবংশের প্রথম শাসক।

নৈরাজ্য ও বিদ্রোহ শক্তহাতে দমন করতে সক্ষম হন। এতে তাঁর শাসনক্ষমতা আরও সুদৃঢ় হয় এবং তিনি উবায়দি শাসকদের থেকে প্রাপ্ত বিশাল ভূখণ্ড সুরক্ষায় পারঙ্গমতার পরিচয় দেন।

একাদশ শতাব্দীর শুরুতে আশিরে[২৭]র গভর্নর হাম্মাদ ইবনে বুলুগিন সানহাজি সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এর ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েক বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। সানহাজি শাসকেরা একটু একটু করে মধ্য মাগরিবের (আলজেরিয়ার) এক বিরাট অংশ হাতছাড়া করে ফেলে। অবশেষে তাদের সাম্রাজ্যের নামটুকু কেবল তিউনিসিয়া ও সিসিলি দ্বীপের ওপর ভিত্তি করে অবশিষ্ট থাকে। সানহাজিদের শাসনামলে গোটা অঞ্চল নগরায়ণ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে বিপুল উন্নতি লাভ করেছিল। সেচমাধ্যম ও সেচব্যবস্থা বিস্তারের কল্যাণে দেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্র অভূতপূর্ব শস্যফলন হচ্ছিল। বহু সংখ্যক অট্টালিকা, গ্রন্থাগার, প্রাচীর ও দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। ফলে তাদের রাজধানী কায়রাওয়ান শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

৪৩৬ হিজরিতে/১০৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সানহাজি শাসক মু'ইয ইবনে বাদিস[২৮] কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত উবায়দি খেলাফত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন এবং একইসঙ্গে বাগদাদের আব্বাসি খিলাফতের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এতে উবায়দি খলিফা আল-মুসতানসির বিল্লাহ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর মন্ত্রী আবু মুহাম্মদ হাসান আল-ইয়াযুরির পরামর্শক্রমে মিসরের মাটিতে যে-সকল বেদুঈন গোত্র স্থায়ী আবাসস্থল তৈরি করেছিল তাদের তিউনিসিয়ার দিকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন। এ-সকল বেদুঈন গোত্রের (যাদের ভিত্তি ছিল বনু হিলাল ও বনু সুলাইম) বিতাড়ন সানহাজি সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। ছিনতাই ও

---

[২৭] বর্তমানে আলজেরিয়ার একটি শহর।

[২৮] আল-মু'ইয ইবনে বাদিস ইবনে মানসুর ইবনে ইবনে বুলুগিন আস-সানহাজি (৩৯৮-৪৫৪ হিজরি/ ১০০৮-১০৬২ খ্রিষ্টাব্দ) : যিরি রাজবংশের গুরুত্বপূর্ণ শাসক। ইফ্রিকিয়া ও কায়রাওয়ানে তাঁর আমিরাত (রাজত্ব) ৪৭ বছর টিকে ছিল। যিরি রাজবংশের একক শাসনের এটি সর্বোচ্চ সময়।

লুণ্ঠনে জর্জরিত হয়ে তাদের রাজধানী বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। হিলালি বংশধারাগুলোর আবাসভূমি ত্যাগের পর গোটা অঞ্চল কয়েক ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বনু খুরাসানের আমিরাত (রাজত্ব), বনু ওয়ারদের রাজ্য ও বনু রান্দের রাজ্য। সানহাজি শাসকেরা সমুদ্র উপকূলীয় এলাকাগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয় এবং মাহদিয়া[২৯]কে তাদের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করে।

৪৫২ হিজরিতে/১০৬০ খ্রিষ্টাব্দে নর্মানরা[৩০] সানহাজি সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ নিয়ে সিসিল দ্বীপের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। এরপর থেকে গোটা অঞ্চল তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ে। ৫২৯ হিজরিতে/১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় রোগার[৩১] জার্বা দ্বীপ[৩২] দখল করে নিতে সক্ষম হন। এরপর তিনি ৫৪৩ হিজরিতে/১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে মাহদিয়া, সোসা (Sousse)[৩৩] ও স্ফাক্স (Sfax)[৩৪] দখল করে নেন। তখন সম্রাট হাসান বিন আলি আস-সানহাজি দখলদারদের বিতাড়িত করার জন্য মাগরিবে আল-মুহাদ সাম্রাজ্যে[৩৫]র প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মুমিন বিন আলির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। পরবর্তী কয়েক বছরে আল-মুহাদ শাসকগণ নর্মানদের থেকে তিউনিসিয়ার দখলকৃত সমস্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করেন। এর ফলে

---

[২৯] তিউনিসিয়ার উপকূলীয় শহর।

[৩০] নর্মান জাতি : নর্মান জাতি ছিল স্ক্যান্ডিনেভিয়া থেকে আগত ভাইকিং দস্যুর দল। এরা ৯ম শতকের প্রথমভাগে উত্তর ফ্রান্সের নরমঁদিতে বাস করা শুরু করে। সেখান থেকে এরা ইংল্যান্ড, দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলি দ্বীপ বিজয় করে।

[৩১] দ্বিতীয় রোগার (Roger II, 22 December 1095- 26 February 1154) : সিসিলির রাজা। কাউন্ট অব সিসিলি হিসেবে তিনি তাঁর শাসন শুরু করেছিলেন।

[৩২] জার্বা (Djerba) :উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে বড় দ্বীপ; আয়াতন ৫১৪ বর্গ কিলোমিটার।

[৩৩] আরবিতে বলা হয় سوسة (সুসা)। তিউনিসিয়ার একটি শহর। রাজধানী তিউনিস থেকে ১৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত।

[৩৪] আরবিতে বলা হয় صفاقس (সাফাকিস)। তিউনিসিয়ার একটি শহর। রাজধানী তিউনিস থেকে ২৭০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।

[৩৫] আদ-দাওলাতুল মুওয়াহহিদা।

তাঁরা আরবি মাগরিবের অধিকাংশ অঞ্চল ও স্পেনের একটি অঞ্চলের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

তারপর ৬০৩ হিজরিতে/১২০৭ খ্রিষ্টাব্দে আল-মুহাদ শাসকগণ ইফ্রিকিয়ায় তাঁদের একজন অনুসারীকে আমির/গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি হলেন আবু মুহাম্মদ বিন আবুল ওয়াহিদ বিন আবু হাফস, অর্থাৎ শায়খ আবদুল ওয়াহিদ বিন আবু হাফসের পুত্র। তাঁর দাদা আবু হাফস উমর বিন ইয়াহইয়া আল-হানতানি ছিলেন মুহাম্মদ বিন তুমার্ত[৩৬]-এর দাওয়াতি অভিযানে তাঁর অন্যতম সহচর।

আবু মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহিদের পুত্র আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন হাফস সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে একক পদাধিকার অর্জনে সক্ষম হন এবং ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দের (৬২৬ হিজরির) ডিসেম্বর মাসে আল-মুহাদ সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীন রাজ্যের ঘোষণা দেন। আবু যাকারিয়া তিউনিস শহরকে তাঁর রাজধানীরূপে গ্রহণ করেন এবং নিজের জন্য 'সুলতান' উপাধি নির্ধারণ করেন। ৬৪৭ হিজরিতে/১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আবু যাকারিয়ার স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-মুসতানসির। তিনি ৬৫৩ হিজরিতে/১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে 'খলিফাতুল মুসলিমিন' ঘোষণা করেন। তারপর ৬৬৮ হিজরিতে/১২৭০ খ্রিষ্টাব্দে গোটা অঞ্চল ক্রুসেড যুদ্ধে আক্রান্ত হয়। ফ্রান্সের রাজা নবম লুই (Louis IX of France) অষ্টম ক্রুসেড আক্রমণের (Eighth Crusade) মধ্য দিয়ে তিউনিসিয়ায় ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা করেন। আল-মুসতানসিরের মৃত্যুর পর ৬৭৫ হিজরিতে/১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসনবিরোধী বেশ কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর কয়েকটি বিদ্রোহ। আবু যাকারিয়া আবু বকরের শাসনামলের পূর্বে গোটা রাজ্যকে একই শাসনাধীন ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। তারপর আবুল

---

[৩৬] মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন ওয়াজলিদ বিন ইয়ামসাল, ইবনে তুমার্ত আল-মাহদি নামে বিখ্যাত। জন্ম ৪৭১ বা ৪৭৪ হিজরিতে এবং ৫২৪ হিজরির ১৩ই রমজান। আশআরি মতবাদ প্রচারে তাঁর রচনাবলি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। তিনি আশআরি চিন্তাধারার সঙ্গে ইবনে হায্ম আয-যাহেরির চিন্তাধারার সংশ্লেষ ঘটিয়েছিলেন।

আব্বাস আহমদ ও আবু ফারিস আবদুল আযিরে শাসনামলে তিউনিসিয়া রাজ্য তার হৃত গৌরব ও ঐশ্বর্য ফিরে যায়। এই দুইজনের শাসনামলে গোটা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সমুদ্র-চলাচলের বিপ্লব ঘটে।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে (হিজরি নবম শতাব্দীতে) তিউনিসিয়া বিপর্যকর অবস্থায় প্রবেশ করে। রাষ্ট্রকে বহুসংখ্যক যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হয়। ৯১৬ হিজরিতে/১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিসিয়া স্পেনের আক্রমণের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়।

হাফসিয়া সাম্রাজ্য ৯৪১ হিজরিতে/১৫৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে প্রবেশ করে। সুলতান আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-হাসান ও তাঁর কনিষ্ঠ ভাই রশিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। রশিদ তুরস্কের উসমানি শাসকদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করেন। উসমানি সেনাবাহিনী খায়রুদ্দিন বারবারুসার নেতৃত্বে হাফসিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী দখল করে নিতে সক্ষম হয়। ফলে সুলতান আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-হাসান স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। চার্লস সুলতানের সাহায্যার্থে ৩৩ হাজার যোদ্ধা ও ৪০০ যুদ্ধজাহাজের সমন্বয়ে এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেন। অবশ্য এর জন্য তিনি পাপাল রাষ্ট্রপুঞ্জ[৩৭], জিনোয়া প্রজাতন্ত্র[৩৮] এবং সভরেইন মিলিটারি অর্ডার অফ মাল্টা[৩৯]-এর সঙ্গে জোট গঠন করেছিলেন। স্পেন ১৬ই জুন রাজধানীর উত্তরে নিম্নভূমিতে অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তারপর তারা হালকুল ওয়াদি বন্দর[৪০] দখল করে নেয়। ২১ শে জুলাই তারা রাজধানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। সুলতান আবদুল্লাহ আল-হাসান পুনরায় সিংহাসনে আসীন হন। কিন্তু তিনি

---

[৩৭] পাপাল রাষ্ট্রপুঞ্জ (Papal States) : পোপের সার্বভৌম শাসনাধীন ইতালির দ্বীপরাষ্ট্রগুলোকে পাপাল স্টেট বলা হতো।

[৩৮] জিনোয়া প্রজাতন্ত্র (The Republic of Genoa) : ইতালির উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে লিগুরিয়ায় ১০০৫ থেকে ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান স্বাধীন রাষ্ট্র।

[৩৯] মাল্টার সার্বভৌম সামরিক আদেশ (Sovereign Military Order of Malta) : ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী এই মিলিটারি অর্ডারের আদর্শবাণী বা মূলমন্ত্র ছিল Defence of the faith and assistance to the poor (বিশ্বাসের সুরক্ষা ও দরিদ্রদের সহায়তা)।

[৪০] Port of La Goulette, Tunis, Tunisia.

চার্লসের সঙ্গে একটি চুক্তিতে সম্মত হতে বাধ্য হন; এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিউনিসিয়া কার্যকরভাবে স্পেনের নিয়ন্ত্রণাধীন চলে যায়।

পরবর্তী বছরগুলোতে 'স্পেন ও তার মিত্রসমূহ এবং উসমানি সুলতানদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে ৯৮২ হিজরিতে/১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে উসমানি সেনাবাহিনী তিউনিস যুদ্ধে স্পেনিশদের ওপর বিজয় লাভ করে এবং তাদেরকে চূড়ান্তভাবে তিউনিসিয়া থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়।

তিউনিসিয়ার আধুনিক ইতিহাস

তিউনিসিয়ার আধুনিক ইতিহাসের সূচনা হয়েছে ৯৮২ হিজরিতে/১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিসীয় অঞ্চলগুলো উসমানি সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে এবং এই ইতিহাসের ব্যাপ্তি ১২৯৮ হিজরিতে/১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি তত্ত্বাবধানের নামে ফ্রান্সের দখলদারত্ব পর্যন্ত।

এই কালপর্বকে তিনটি শাসনামলে ভাগ করা যায় :

১। পাশাদের[৪১] শাসনামল : এই সংক্ষিপ্ত কালপর্ব; এর ব্যাপ্তি হলো ৯৮২-৯৯৯ হিজরি/১৫৭৪-১৫৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিউনিসিয়ায় একজন প্রশাসক থাকতেন যাকে সরাসরি উসমানি সুলতানের পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা হতো।

২। দায়িদের[৪২] শাসনামল : এটিও সংক্ষিপ্ত কালপর্ব; এর ব্যাপ্তি প্রায় চার যুগ, ৯৯৯-১০৩৯ হিজরি/১৫৯১-১৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই কালপর্বের শুরুতে কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে তিউনিসিয়ার প্রশাসক নিযুক্ত করা হতো।

---

[৪১] উসমানি সাম্রাজ্যে বীরত্বসূচক উপাধি। উসমানি সুলতান প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, জেনারেল, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ ও বিচারকদের এই উপাধি দিতেন।

[৪২] দায়ি (তুর্কি ভাষায় : dayi) : এই উপাধি মূলত প্রয়োগ করা হতো উসমানি জানিসারি সেনাপতির ক্ষেত্রে, পরে তা ১৬৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উসমানি সাম্রাজের একটি কর্তৃত্বের পদবিও হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে তিউনিসিয়ায় ১৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ, আলজেরিয়ায় ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দ এবং পশ্চিম ত্রিপোলিতে ১৭১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের শাসকদের জন্য এই উপাধি চালু থাকে। সামরিক, ধর্মীয় ও নাগরিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চতর কমিটির সদস্যগণের পক্ষ থেকে আজীবনের জন্য দায়ি মনোনীত করা হতো।

...এরপর ১০০৬-১০১৯ হিজরি/১৫৯৮-১৬১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিউনিসিয়া শাসক করে দাঈ উসমান। তাঁর পরে আসেন দাঈ ইউসুফ, তিনি ১০১৯-১০৪৮ হিজরি/১৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন।

৩। বেগদের[৪৩] শাসনকাল : সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তিউনিসিয়ার শাসনে পরিবারতন্ত্রের সূচনা ঘটে। উত্তরাধিকার সূত্রে দুটি পরিবার শাসনক্ষমতা ভোগ করে। প্রথমত মুরাদি পরিবার ১১১৪ হিজরি/১৭০২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিউনিসিয়া শাসন করে। তারপর দুটি বছর (১১১৪-১১১৭ হিজরি/১৭০২-১৭০৫ খ্রিষ্টাব্দ) কাটে যুগসন্ধিক্ষণে; তারপর হুসাইনি পরিবার রাজ্যক্ষমতা দখল করে। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এই পরিবার তিউনিসিয়া শাসন করে। এই পরিবারই বারদো চুক্তি[৪৪]তে স্বাক্ষর করে এবং এই চুক্তির শর্তাবলির ফলেই তিউনিসিয়া ফ্রান্সের কলোনিতে পরিণত হয়।

---

[৪৩] বে, বেক বা বেগ : একটি তুর্কি উপাধি। মূল অর্থ হলো গোত্রকর্তা। তারপর এই উপাধির উৎকর্ষ ঘটে এবং তা কোনো এলাকার শাসকের জন্য প্রযুক্ত হতে থাকে। সামরিক পদবির জন্যও শব্দটির ব্যবহার চালু হয়। উসমানি যুগে তিউনিসিয়ার শাসকদের ক্ষেত্রে এই উপাধি প্রয়োগ করা হয়।

[৪৪] বারদো চুক্তি বা কাসরুস সাঈদ চুক্তি : ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এক পক্ষে স্বাক্ষর করেন তিউনিসিয়ার বেগ মুহাম্মদ আস-সাদিক এবং অপরপক্ষে স্বাক্ষর করেন তিউনিসিয়া-সুরক্ষা-সংক্রান্ত ফরাসি কর্তৃপক্ষ।

তিউনিসিয়ায় ফ্রান্সের দখলদারত্ব

আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা তিউনিসিয়ার ওপরও আধিপত্য বিস্তারের জন্য দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে। অবশেষে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে তারা কার্যকরীভাবে দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। যখন কতিপয় তিউনিসীয় গোত্র কর্তৃক আলজেরিয়া সীমান্তে আক্রমণের ঘটনা ঘটে তখনই তারা সামরিক বাহিনী হিসেবে ধীরে ধীরে তিউনিসিয়ায় প্রবেশ করে।

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মে বারদো[৪৫]তে তৃতীয় মুহাম্মদ বেগের প্রাসাদ অবরোধ করা হয়। সেনা-কমান্ডার ফরাসি জেনালেন ব্রেয়ার[৪৬] এবং কনসাল রোস্তান[৪৭] তৃতীয় মুহাম্মদ আস-সাদিক বেগের কাছে বারদো চুক্তির নীতিমালা পেশ করেন। এই চুক্তির শর্ত অনুসারেই ফ্রান্স তিউনিসিয়ার ওপর প্রতিরক্ষা-কর্তৃত্ব[৪৮] লাভ করে।

বেগ মুহাম্মদ আস-সাদিক চুক্তি-সংক্রান্ত আলোচনাকালে তাঁর দেশের ওপর ফ্রান্সের প্রতিরক্ষা-কর্তৃত্বের চিন্তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলে যে, ইউরোপীয় দেশগুলো এতে নাক গলাবে এবং তাঁর পাশে দাঁড়াবে। অথবা উসমানি সাম্রাজ্যের সুলতান তিউনিসিয়ায় তাঁর নৌবহর পাঠাবেন। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি।

---

[৪৫] তিউনিসের পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর।

[৪৬] জুল এইম ব্রেয়ার (Jules Aimé Bréart) : জন্ম ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি। আলজেরিয়ায় যুদ্ধসহ বেশ কয়েকটি যুদ্ধে ফরাসি সেনাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন।

[৪৭] Théodore Justin Dominique Roustan.

[৪৮] ফ্রান্স ছিল তিউনিসিয়ার প্রটেকটোরেট রাষ্ট্র। প্রটেকটোরেট (protectorate) : দুর্বল বা অনুন্নত দেশের প্রতিরক্ষায় ও পরিচালরায় নিয়োজিত কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র। বারদো চুক্তির দ্বারা The French protectorate of Tunisia (الحماية الفرنسية في تونس) রচিত হয়।

যেদিন ফরাসি সেনাশক্তি তিউনিসিয়ায় তাদের শিবির স্থাপন করে সেই দিনই ফ্রান্সের জেনারেল কনসাল মুহাম্মদ আস-সাদিকের একটি চুক্তির খসড়া পেশ করেন এবং তাতে তাঁর স্বাক্ষর দাবি করেন। তাঁকে রাত নয়টা পর্যন্ত এই চুক্তি গ্রহণ করার অথবা প্রত্যাখ্যান করার অবকাশ দেওয়া হয়।

মুহাম্মদ বেগ তাঁর রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন এবং তাঁদের কাছে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি উপস্থাপন করেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ঝোঁক ও আগ্রহ ছিল ফ্রান্সের আধিপত্যমূলক চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং মুসলমানদেরকে এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা; কিন্তু ফরাসিদের হুংকারের সামনে তাঁদের আগ্রহে সাড়া মেলেনি। মুহাম্মদ আস-সাদিক ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান; ফলে তারা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তাঁর ভাই তায়্যিব বেগকে সিংহাসনে বসায়। মুহাম্মদ আস-সাদিক যে-কক্ষে তাঁর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন তার পাশের কক্ষেই ফরাসি দখলদারত্বের কুশীলবরা অপেক্ষা করছিল। বৈঠকে বসার দুই ঘণ্টা পর তিউনিসিয়ার শাসক মুহাম্মদ আস-সাদিক চুক্তির দুটি খসড়াপত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসেন; ইতিমধ্যে পত্র দুটিতে তিনি স্বাক্ষর করেছেন। বারদো চুক্তি নামে পরিচিত দাসখতের নামান্তর এ-চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তিউনিসিয়ার ওপর ফরাসি আধিপত্য চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। এ-চুক্তির শর্তগুলো বেগের (তিউনিসিয়ার স্থানীয় শাসক) ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে এবং তাঁকে ফরাসি প্রতিরক্ষা-কর্তৃত্বের অধীন একটি পুতুল-শাসকে পরিণত করে। এই চুক্তির দ্বারা তিউনিসিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও মানদণ্ড হারায়।

এই চুক্তির দাবি অনুযায়ী ফ্রান্স তাদের তিউনিসিয়া-কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি দেয়; শুধু তাই নয়, তারা আবাসিক ফরাসি জেনারেলে[৪৯]র মাধ্যমে শক্তিশালী তত্ত্বাবধানেরও ব্যবস্থা করে। বারদো চুক্তিতে স্পষ্টভাবে আরও বলা হয় যে, হুসাইনি সিংহাসনকে সুরক্ষাদানে ফ্রান্স প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। (তৃতীয় অধ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।) ফান্সের প্রতিরক্ষা-

---

[৪৯] French resident-general in Tunisia.

Contents

কর্তৃত্বের কালে তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রীয় নাম ছিল আরবিতে আল-আমালাতু আত-তিউনিসিয়্যাহ এবং ফরাসি ভাষায় La régence de Tunis.

ফ্রান্স এ-সকল রাজনৈতিক সাফল্য অর্জনে সন্তুষ্ট থাকা যথেষ্ট মনে করেনি; বরং তারা তিউনিসিয়ার ওপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বিস্তারের অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তারা আত-তায়্যিব বেগকে –যিনি ছিলেন কার্যকরী কর্তৃত্বশূন্য– আবাসিক ফরাসি জেনারেল পল খ্যাবোঁ[৫০]র সঙ্গে নতুন একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। এটির নাম ছিল মুআহাদু আল-মুরসাল কাবির[৫১] (বড় বন্দর চুক্তি)। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জুন এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ-চুক্তির শর্তগুলোর দ্বারা তিউনিসিয়ার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফ্রান্স তিউনিসিয়াকে সরাসরি পরিচালনা করতে শুরু করে।

ফ্রান্সের দখলদারত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া

তিউনিসিয়ার জনগণ ফ্রান্সের দখলদারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু ফ্রান্স চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করে তিউনিসীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের কোমর ভেঙে দেয়। তারপর তিউনিসিয়ার ভূমিতে দখলদারত্বের শেকড় দৃঢ়মূল করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারা একটি পরামর্শ সভা গঠন করে। ফরাসি ও ইতালীয়দের মধ্যে যারা তিউনিসিয়ায় অভিবাসী হতে চায় তাদের জন্য দরজা খুলে দেয়। দেশের নাগরিকদের ওপর ফরাসি দখলদারদের দমন-পীড়ন তীব্র হয়ে ওঠে। মুসলমানরা তা অনুভব করেন। কারণ ফ্রান্স পৃথিবীর যে-ভূখণ্ডেই ঔপনিবেশিক দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানেই ইসলামি পরিচয় বা মুসলিম জাতিসত্তাকে লুপ্ত করার চেষ্টা করেছে। মুসলমানদের সাংস্কৃতিক দিকগুলোই ছিল তাদের লক্ষ্যবস্তু। যা মুসলমানদের বার বার জ্বলে উঠতে বাধ্য করেছে। ফ্রান্স বরাবরই পরিচিত প্রতীক 'আপোসহীনতা' ব্যবহার করেছে।

ফ্রান্স জাতীয়তার ক্ষেত্রে নতুন নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই নীতির ফলে তিউনিসীয় জাতীয়তার ধ্বংসসাধন বৈধতা পায় এবং আগ্রহীদেরকে তিউনিসীয় জাতীয়তার পরিবর্তে ফরাসি জাতীয়তা প্রদান

---

[৫০] Pierre Paul Cambon, Resident-General (23 Jun. 1885 to 28 Oct. 1886)

[৫১] Treaty of Mers El Kébir.

করা হয়। ফরাসি জাতীয়তা গ্রহণকারীরা ফ্রান্সের প্রজায় পরিণত হয় এবং ফ্রান্সের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব অটুট রাখার দায়িত্ব তাদের কাঁধেও অর্পিত হয়। মুসলমানগণ সামাজিকভাবে ও বিশ্বাসগত দিক থেকে এই নীতি প্রত্যাখ্যান করেন। ফরাসি জাতীয়তা প্রার্থী প্রত্যেক মুসলমানের সঙ্গে তাঁরা সম্পর্ক ছিন্ন করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা এই শ্রেণির লোকদের ইসলাম-বহির্ভূত ঘোষণা করেন এবং তাদেরকে মুসলমানদের গোরস্তানে দাফন করা সঠিক হবে না বলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। ফরাসি নীতি-বিরোধী এই শক্তি ও আন্দোলন যারা জাতীয়তা পরিবর্তন করেছিল তাদের অনেককেই ফরাসি জাতীয়তা ত্যাগ করে শেকড়ে ফিরে আসতে বাধ্য করে। এই শক্তির বিরুদ্ধে ফরাসিরা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। ফলে ফরাসি ঔপনিবেশিক দখলদাররা তিউনিসিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে।

তারপর ফরাসি সরকারব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। সমাজতন্ত্রীরা সরকার গঠন করে। তারা ঘোষণা করে যে, তিউনিসিয়ার সমাজতন্ত্রী শ্রেণি বাদে আর কারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও বোঝাপড়া করা সম্ভব নয়। এটা ছিল এক বিরাট ফাঁদ; প্রচারমুখী ও খ্যাতিপ্রত্যাশী যুবকেরা এই ফাঁদে আটকে যায়। তিউনিসীয় সমাজতান্ত্রিক দলের আবির্ভাব ঘটে। নতুন কিছু নাম চোখে পড়ে, যেমন : শাযিলি খায়রুল্লাহ, হাবিব বুরগিবাহ, মুহাম্মদ আল-মাতিরি ইত্যাদি। তাঁরা ছিলেন যুবক। ফ্রান্স তাদের উদ্ভাসিত ও খ্যাতিমান করে তুলতে পরিচিত পন্থা অবলম্বন করে। যেমন : গ্রেপ্তার, নির্বাসন, দেশান্তর, সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। ঠিক এই সময় রাজনীতির বলয় থেকে ইসলামি ভাবধারার অবসান ঘটে, যা সব শ্রেণির দখলদারদের বিশেষ করে ক্রুসেডপন্থী দখলদারদের মাথাব্যথার কারণ ছিল। ফলে তিউনিসিয়ার দখলদারত্ব-বিরোধী প্রতিরোধ স্বভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ও গতি-প্রবণতায় সমাজতন্ত্রী হয়ে ওঠে।

ফ্রান্স তিউনিসিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেই ক্ষান্ত থাকেনি; বরং ফরাসিদের স্থানান্তরের জন্য একটি এলাকা নির্ধারণ করতে চায় যেখানে তারা আবাসস্থল গ্রহণ করবে ও স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। এই জন্য তারা যে-নীতিমালা গ্রহণ করে তার মূলকথা নিম্নরূপ :

১। যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব ফরাসিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আবাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভ্রমণভাতা ইত্যাদি নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও মোটা অঙ্কের বেতন নির্ধারণ করে ফরাসিদেরকে প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তিউনিসিয়ায় কর্মরত একজন ফরাসি চাকরিজীবীর ৪৩ প্রকারের ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা ছিল এবং ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে তিউনিসিয়ায় দেশীয় চাকরিজীবীদের তুলনায় ফরাসি চাকরিজীবীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৫ ভাগ। প্রশাসন ও শিক্ষাব্যবস্থায় আরবি ভাষার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং তার স্থান দখল করেছিল ফরাসি ভাষা।

২। ফরাসি প্রশানক ফ্রান্সের দাখলদারদের (তাদের মধ্যে প্রায় ৫% ছিল ইউরোপীয়) জন্য বিশাল আয়তনের ভূমির মালিকানা লাভের সুযোগ করে দেয়। তাদের কাছে তিউনিসিয়ার ভূমিসমূহ নামমাত্র মূল্যে ও দীর্ঘমেয়াদি কিস্তিতে বিক্রি করে দেওয়া হয়। একইভাবে বনভূমিও তাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। এমনকি শহরগুলো অনেক ওয়াক্‌ফকৃত ও খাস জমি স্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তর করা হয়, যাতে তা ফরাসিদের কাছে বিক্রি করা যায়। ফ্রান্সের দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ফরাসি আনফাদা কোম্পানি দক্ষিণ তিউনিসিয়ায় এক বিশাল আয়তনের ভূমি (১ লাখ হেক্টর) ক্রয় করে নেয়। ফ্রান্স প্রতিরক্ষা-কর্তৃত্ব গ্রহণের পর ফরাসিদেরকে বিশেষ পন্থায় জমি ক্রয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। তিউনিসিয়ার রাজধানী, বিনযারত[৫২] ও মাতিরে[৫৩]র সমতলভূমি বিশেষ পদ্ধতিতে বেচা-কেনার কেন্দ্র। সরকারি যে-বেচাকেনার প্রতি আমরা ইঙ্গিত করেছি তার অধিকাংশই হয়েছিল মধ্য ও দক্ষিণ তিউনিসিয়ায়। ঔপনিবেশিক দখলদাররা বিশেষ পদ্ধতির সুবিধা নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ৫৪০ হাজার হেক্টর ভূমি মালিকানা লাভে সক্ষম হয়েছিল। এর মধ্যে ১৪ হাজার হেক্টর ছিল ইউরোপীয়দের জন্য। প্রশাসনিক উপনিবেশ তাদের হস্তক্ষেপের নিয়ন্ত্রণাধীন রেখেছিল ৬০০

---

[৫২] শহরটির নাম আরবিতে بنزرت এবং ইরেজিতে Bizerte ev Bizerte। রাজধানী তিউনিস থেকে ৬৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।

[৫৩] বা শহরটি উত্তর তিউনিসিয়ায় লেক ইশকুল ন্যাশনাল পার্কের (Lac Ichkeul National Park) কাছেই অবস্থিত।

হাজার হেক্টরের চেয়ে বেশি ভূমি। অর্থাৎ, তিউনিসিয়ার ভূখণ্ডে বসবাস ও ফসল উৎপাদনের উপযোগী যত ভূমি ছিল তার শতকরা ৩০ ভাগই ছিল ঔপনিবেশিক দখলদারদের হাতে এবং তাদের অধিকাংশই ছিল ফরাসি।

৩। ভালো ভালো ভূমির মালিকানা গ্রহণের পাশাপাশি ফ্রান্স অর্থনৈতিক উৎসগুলোকেও ফরাসিদের হাতে তুলে দেয়। প্রধান প্রধান কলকারখানা, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য, যোগাযোগ ও পরিবহন-ব্যবস্থা, ফসফেট আহরণ সবকিছুই ছিল ফরাসিদের একচেটিয়া দখলে। (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ব্যক্তি মালিকানা ও কোম্পানি মালিকানার আওতাধীন দেশের শতকরা ৬১ ভাগ বহির্বাণিজ্য ছিল ফরাসিদের হাতে।)

৪। ফরাসি মাল-মশলা ও রসে-গন্ধে প্রস্তুতকৃত শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়। কোনো ধরনের রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ও অর্থনৈতিক সাহায্য ব্যতিরেকে বিশেষ শিক্ষাকে স্বাধীন রাখা হয়। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি স্কুলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রী ছিল ১৩৪ হাজার। আর সব বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলিয়ে সাকুল্যে ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৩০ হাজার। অথচ প্রাথমিক শিক্ষার বয়সি শিশুর সংখ্যা ছিল ৬০০ হাজার। অর্থাৎ, সকল সরকারি ও বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মিলিয়ে মূল সংখ্যার মাত্র ২৯%[৫৪] শিশু-কিশোরকে ধারণ করতে পারছিল। সরকারি স্কুলগুলোতে মোট ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ২২%ই ছিল ফরাসি; অথচ তিউনিসিয়ায় বসবাসকারী ফরাসিদের সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর ৫%-এর চেয়ে বেশি ছিল না। তা ছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বণ্টনও করা হয়েছিল অসমভাবে; ফরাসি জনগোষ্ঠী যেখানে (উত্তর তিউনিসিয়ার এলাকাগুলোতে) বেশি ছিল সেখানে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল অধিক, অন্যদিকে দক্ষিণ তিউনিসিয়ায় এ-ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল খুব কম। আর মাধ্যমিক শিক্ষার পুরোটাই ছিল ফরাসি প্রশাসনের হাতে; উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর ব্যাপারে একই কথা খাটে। উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্য সাহিত্য ও আইনেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফরাসিরা আয-যাইতুনা মসজিদের (জামে আয-যাইতুনার) ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে অভিলাষ

---

[৫৪] প্রকৃত বিচারে ২৭.৩৩%।

প্রকাশ করে। ফরাসিরা দাবি করে যে তারা জামে আয-যাইতুনার সংস্কার চায়, যাতে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাগত সেবা অধিকতর উপকারী হয়!

তিউনিসীয় জনগোষ্ঠী ফরাসি দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠার পরপরই প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নেও তারা বিপ্লব ঘটাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। এই লক্ষ্যে তারা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছিল। শায়খ মুহাম্মদ আস-সানুসি ও শায়খ আল-মাকি বিন আযুযের প্রথম দুটি আন্দোলন সংঘটিত হয়। তাঁদের প্রথমজনকে নিষিদ্ধ করে দেশান্তর করা হয় এবং দ্বিতীয়জনকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এই আন্দোলন দুটির পর ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে 'আল-হাদিরা' দলের হাতে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। কিন্তু ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে তা অধিকতর শৃঙ্খলিত ও কাঠামোবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে। এর নেপথ্য কারণ ছিল 'তিউনিস আল-ফাতাত' দলের আবির্ভাব। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আলি বাশ হাম্বা ছিলেন এই দলের সংগঠক। এই বছর তাকে দেশান্তরে পাঠানো হয়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে কতিপয় রাজনীতিবিদ প্যারিস শান্তি সম্মেলন (প্যারিস পিস কনফারেন্স, ১৯১৯) থেকে ফায়দা হাসিলে বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্থির করেন এবং ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে শায়খ আবদুল আযিয আস-সাআলিবির সভাপতিত্বে 'আল-হিযবুল হুর্ আদ-দাসতুরি'[৫৫] গঠন করেন।

এই দল সরকারপ্রধানে[৫৬]র কাছে আবেদন পেশ করে এবং একটি নিম্নবর্ণিত দাবিগুলো জানায় :

১. তিউনিসিয়া ও ফ্রান্স উভয় দেশের সদস্যদের সমন্বয়ে আইন পরিষদ গঠন;

২. তাঁর কাছে জবাবদিহিতে বাধ্য থাকবে এমন একটি সরকার গঠন;

৩. সরকারের তিনটি বিভাগের (আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ) বণ্টন;

৪. তাঁদের সরকারে তিউনিসীয়দের চাকরিদানের সুযোগ প্রদান;

---

[৫৫] The Constitutional Liberal Party. দাসতুর নামে সমধিক পরিচিত।

[৫৬] তায়্যিব জালুলির, যিনি তখনও তিউনিসিয়ার নামেমাত্র সরকারপ্রধান ছিলেন। তায়্যিব জালুলি তিউনিসিয়ার সর্বশেষ বেগ।

৫. কৃষি অধিদপ্তর থেকে ভূমি ক্রয় (ফরাসি দখলদারদের অনুকরণে);

৬. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ;

৭. শিক্ষা বাধ্যতামূলককরণ। প্যারিসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয় এবং দলটি তাতে তিউনিসিয়ার স্বাধীনতার দাবি জানায়।

তিউনিসিয়ায় ফরাসি দখলদারত্বের সাংস্কৃতিক প্রভাব

দখলদারদের শাসনকালে সাংস্কৃতিক বাস্তবতা

প্রভাবশালী সাংস্কৃতিক কর্মপরিমণ্ডলে অগ্রগামী স্থান দখল করে ছিল ঐতিহ্যগত মক্তবভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা। দ্বীনি শিক্ষার এই পদ্ধতি ছিল বহুলপ্রচলিত ও কর্তৃত্বশালী। প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্যে তা আরব অঞ্চলের ভূমিকা পালন করেছে। এই শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি হলো দ্বীনি শিক্ষা। কুরআনুল কারিম হিফজ, পাঠ ও সহজ হস্তাক্ষর শিক্ষাদানের ওপর এই ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষাপদ্ধতি কেবল মাগরিবে বা মাগরিবের অঞ্চলগুলোতে (উত্তরপশ্চিম আফ্রিকায়) সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা গোটা আরব বিশ্বে বহুলচর্চিত। এই শিক্ষাপদ্ধতি যুগের পর যুগ ধরে যে-কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে তা হলো আরবি ভাষা ও তার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সুরক্ষা, যদিও তা ঐতিহ্যগত (প্রাচীন) পরিমণ্ডলের বাইরে বিকশিত হয়নি।

দ্বিতীয় প্রকারের শিক্ষাব্যবস্থা হলো আধুনিক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা। ঔপনিবেশিক শাসনকালে জাতীয় সংগঠন ও দলসমূহের তত্ত্বাবধানে তা পরিচালিত হয়। এ-শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য ছিল আরবি ভাষার হেফাজত এবং একইসঙ্গে দেশের জাতীয় চারিত্র্যের সুরক্ষা।

তৃতীয় প্রকারের শিক্ষাব্যবস্থা হলো এই অঞ্চলে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রচলিত মিশনারি শিক্ষা। এ-শিক্ষাব্যবস্থা ছিল খ্রিষ্টবাদ প্রচার ও লোকজনকে ধর্মান্তরকরণে খ্রিষ্টান মিশনারি তৎপরতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

চতুর্থ প্রকারের শিক্ষাব্যবস্থাটি ঔপনিবেশিক দখলদারত্বের সময়ে প্রচলিত ছিল। দখলদার শাসকেরা যে-সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলেছিল সেগুলোতে

এই শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। পশ্চিমা উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের সন্তানেরা ও ভিনদেশি সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী ছিল। স্থানীয় ছেলে-মেয়েদের এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। যাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হতো তাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভিনদেশি ছেলে-মেয়েদের সেবা প্রদান; সেইসঙ্গে অঙ্গীভূতকরণ নীতির বাস্তবায়ন এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইনের প্রয়োগে ঔপনিবেশিক নীতিমালার অনুসরণ।

ফলে স্থানীয় নাগরিকদের সন্তানেরা আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল; তাদের সামনে মক্তবভিত্তিক শিক্ষা বা মিশনারি স্কুলগুলোতে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ ছাড়া কিছু ছিল না। মক্তবভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল প্রান্তিক ও প্রাচীন। অথবা তাদের জাতীয় সংস্থা ও সংগঠনসমূহের ব্যবস্থাপনাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে হতো। এসব প্রতিষ্ঠানকে নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হতো। ফলে এই জাতির নিয়তি ছিল অজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্‌পদতা। এভাবে সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশবাদের জন্য ঐতিহাসিক, ভাষিক ও উত্তরাধিকারের দিক থেকে দেশীয় সংস্কৃতির বিকল্পরূপে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকে হাজির করার মধ্য দিয়ে প্রভাব বিস্তার সম্ভব হয়।[৫৭]

ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রথম শিকার ছিল আরবি ভাষা। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব-বলয় থেকে তা নিস্তার পায়নি। বরং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আরবি ভাষাই ছিল তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। ঔপনিবেশিক দখলদার শাসকেরা তিউনিসিয়ায় আরবি ভাষাকে একটি ভিনদেশি ভাষা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল। এই রাজনৈতিক শক্তি কতিপয় স্থানীয় বুদ্ধিজীবীকে ঔপনিবেশিক চিন্তার ছাঁচে ঢালাই করে নিয়েছিল। তারা গতকাল যা চিন্তা করত, আজও তা-ই চিন্তা করে। দখলদার শক্তি আরবি ভাষার বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ের ক্ষেত্রে এটিকে একমাত্র স্বাধীন কার্যকারণ হিসেবে বিবেচনা করত; কারণ, আরবি ভাষাই তিউনিসীয় জাতি ও

---

[৫৭] الإستيطان الأجنبي في الوطن العربي...المغرب العربي- فلسطين-الخليج العربي: دراسة تاريخية مقارنة, আবদুল মালিক খালফ আত-তামিমি, পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭।

দখলদারত্ব এবং খাঁটি জাতিসত্তা ও ঔপনিবেশিক বিকৃতি-ক্রিয়ার মধ্যকার লড়াইয়ে কার্যকরী বুদ্ধিবৃত্তিক অস্ত্র।

দখলদার প্রশাসন আরবি ভাষার অস্তিত্ব ও জাতীয় চারিত্র্যকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে চালিত তাদের কর্মতৎপরতাকে আইনগত বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই প্রেক্ষিতে তারা বেশ কিছু আইন জারি করেছে। এসব আইনের দাবি হলো ইসলামি শিক্ষা কুরআন হিফজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা; কুরআনের তাফসিরের পাঠদান না-করা, যা স্বাধীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে; ইসলামি-আরবি ইতিহাস ও স্থানীয় জাতীয় ইতিহাসের পঠন-পাঠন অসম্ভব করে তোলা, তিউনিসীয় অঞ্চলের ও অন্যান্য আরব অঞ্চলের ভূগোল পাঠ সীমাবদ্ধ করা এবং আরবি সাহিত্যের পাঠ নিষিদ্ধ করা।

ঔপনিবেশিক দখলদাররা এই অঞ্চলে নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধি করে এবং মূর্খতা, কুসংস্কার ও রূপকথার বিস্তার ঘটায়। তিউনিসীয় জাতি তাদের দেশে সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। ফলে দেশীয় নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ্যাত্ববরণ করে।

ফরাসি দখলদার শাসকেরা এরূপ বর্বর ও অসভ্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তিউনিসিয়াকে কয়েক যুগ পেছনে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক যুগে এটাই ছিল দখলদারদের চরিত্র, যদিও তাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন..।

তিউনিসিয়ায় প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা

তিউনিসীয় জাতি দীর্ঘ কয়েক দশক ফরাসি দখলদার শক্তিগুলোর হাতে জুলুম-নির্যাতন-উৎপীড়ন-অপমান-লাঞ্ছনা ভোগ করল। তারপর দখলদাররা রক্তক্ষয়ী দমন-পীড়নের পথ অবলম্বন করল। তিউনিসীয়দের যেকোনো স্বাধীনতাকামী প্রতিরোধকে তারা দমন করল; মুক্তি ও মর্যাদার মতো মানবাধিকার প্রত্যাশী আন্দোলনগুলোর কোমর ভেঙে দিল। বলে-কয়ে ও লোকদের চোখের সামনে রাষ্ট্রের সম্পদ ও অর্থনৈতিক উৎসগুলো দখলিস্বত্ব হাতিয়ে নিল। ফরাসি ভাষাবিস্তারনীতি[৫৮]র মধ্য দিয়ে ফরাসি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করল। ফরাসি দখলদাররা তিউনিসিয়ার সমাজব্যবস্থা এবং সামাজিক মূল্যবোধ ও মানদণ্ডকে ধ্বংস করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রধানত এই নীতির ওপরই নির্ভর করেছিল। দখলদারদের এ-জাতীয় প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ উদ্যোগ ছিল, যা আমরা দেখেছি, আরবি ভাষা, অর্থাৎ, কুরআনের ভাষার বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ ঘোষণা করা। এই ভাষাই তিউনিসীয় জাতির সন্তানদেরকে তাদের শেকড়ের সঙ্গে এবং ইসলামের গভীর মূলের সঙ্গে আঁকড়ে রেখেছিল।

---

[৫৮] ফরাসি ভাষাবিস্তারনীতি (ফরাসি : La Francisation, ইংরেজি : Francization, আরবি : سياسة الفَرْنَسَة) : নীতিগুলো এরূপ :

১. দখলকৃত দেশে ফরাসি ভাষা বিস্তার করা এবং প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে ওই দেশের প্রধান ভাষার মতো তা আবশ্যক করা;

২. একটি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা, যাতে ওই দেশের ভাষাকে (আরবি ভাষাকে) ভিনদেশি ভাষা আখ্যায়িত করা হয়েছে;

৩. আরবি শিক্ষাসংস্কৃতির কেন্দ্রগুলো (মসজিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও বইপুস্তক) ধ্বংস করে দেওয়া;

৪. রাস্তাঘাট, গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ও স্থাপনা, এলাকা ও শহরের ফরাসি নাম দেওয়া;

৫. দখলকৃত দেশের ইতিহাস ও মানচিত্র পাল্টে দিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত করে নতুন ইতিহাস ও মানচিত্র রচনা করে পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ বইপুস্তকে স্থান দেওয়া;

৬. জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় বইগুলো ফরাসি ভাষায় রূপান্তর করা, ইত্যাদি।

Contents

অবেশেষ অন্ধকার ভেদ করে আলোর রেখা দেখা যায়; ফরাসি দখলদাররা তিউনিসিয়া ত্যাগ করে চলে যায় এবং তিউনিসীয় জাতি তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লাভ করে। তারা দেশপ্রেমে উৎসর্গপ্রাণ নেতৃত্বের অধীন একটি নতুন যুগের সূচনা করে। এই নেতৃত্ব অপমান ও লাঞ্ছনার দাগ মুছে দিতে এবং দেশটির হাত ধরে উন্নয়ন, উৎকর্ষ ও অগ্রগামিতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।

এসব স্বপ্ন ও অঙ্গীকার কি বাস্তবতার মুখ দেখেছিল?

তিউনিসিয়ার গণপরিষদ ১২৭৬ হিজরির ২৮ শে জিলহজ, মোতাবেক, ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ শে জুলাই সর্বসম্মতিক্রমে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে এবং প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। স্বাধীনতার ঘোষণার দেড় বছর পর প্রজাতন্ত্রের এই ঘোষণা আসে। এর উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক জীবনে ও রাষ্ট্রের স্তম্ভগুলোর ওপর নিও কন্‌স্টিটিউশনাল লিবারেল পার্টির (New Constitutional Liberal Party)[৫৯] নেতা হাবিব বুরগিবা ও তার দলের কর্তৃত্বকে পাকাপোক্ত করা।

গণপরিষদ সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের কাঠামোতে একটি নতুন সংবিধান প্রস্তুতকরণে দাপ্তরিকভাবে আগ্রহী ছিল বটে, কিন্তু দেশটি স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এমনকিছু আলামত প্রকাশ পাচ্ছিল যা সরকারব্যবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত দিচ্ছিল। পঁচাত্তর বছরের দখলদারত্ব দেশটিকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলার পর হুসাইনি সরকারব্যবস্থা স্বভাবতই ছিল অকেজো। তা ছাড়া সময়টা ছিল নিও কন্‌স্টিটিউশনাল লিবারেল পার্টির উত্থানের; এই পার্টিই ছিল স্বদেশি আন্দোলনের পুরোধা, তারা তিউনিসিয়ার দখলদার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হয়েছিল। হাবিব বুরগিবার এই দল দেশের মূলধারার ট্রেড ইউনিয়নগুলোরর সঙ্গে জোট গঠন করেছিল। ফলে তারা ১৯৫৬ সালের এপ্রিলের নির্বাচনে জাতীয় গণপরিষদের সবগুলো আসনে জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়।

মুহাম্মদ আল-আমিন বেগ নিও কন্‌স্টিটিউশনাল লিবারেল পার্টির সভাপতি হাবিব বুরগিবাকে ১৩৭৫ হিজরির ৪ঠা শাওয়াল, ১৯৫৬ সালের ১৫ই

---

[৫৯] আরবি : الحزب الحر الدستوري الجديد; Neo Destour নামে পরিচিত।

Contents

এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করেন। এই মাসেই নির্বাচিত গণপরিষদ দেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য বৈঠক করেন। ১৩৭৫ হিজরির ২৪ শে জিলহজ, ১৯৫৬ সালের ১লা জুন দেশটির সংবিধানের কার্যকরী আত্মপ্রকাশ ঘটে। পাঁচ মাস পর তা পার্লামেন্টে গৃহীত হয়।

কে এই বুরগিবা?

তিউনিসিয়ার সাবেক রাষ্ট্রপতি হাবিব বুরগিবা ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট উপকূলীয় শহর মুনসাতিরে তারাবলুসিয়া (ত্রিপোলি) মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাদিকি কলেজ (আল-মাদরাসাতুস সাদিকিয়্যাহ) থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর তিউনিসের লিসি কারনো ইনস্টিটিউটে[৬০] ভর্তি হন। এখানে শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্যারিসে গমন করেন।

প্যারিসে হাবিব বুরগিবা আইন কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে আইন কলেজ থেকে ডিগ্রি লাভ করেন। তিউনিসিয়ায় ফিরে এসে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত হন। তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে নিউ কনস্টিটিউশনাল লিবারেল পার্টি (New Constitutional Liberal Party) গঠন করেন। এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজনৈতিক তৎপরতার কারণেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

হাবিব বুরগিবা প্রথমবার ফরাসি বিধবা ম্যাথিল্ড লরেইনকে বিয়ে করেন। বাইশ বছর পর তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।[৬১] ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার তিনি ওয়াসিলা বিনতে মুহাম্মদ বিন আম্মারকে বিবাহ করেন। ওয়াসিলার সঙ্গে হাবিব বুরগিবার পরিচয় ঘটেছিল কায়রোতে; সেখানে তিনি নির্বাসিত হয়ে জীবনের একটি অংশ কাটিয়েছিলেন।

এরপর হাবিব বুরগিবাকে দক্ষিণ তিউনিসিয়ায় অন্তরিন করে রাখা হয়। কিছুদিন পর ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

---

[৬০] ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির নাম পাল্টে দেওয়া হয়। এর নাম হয় তিউনিস বুরগিবা মডেল ইনস্টিটিউ (معهد بورقيبة النموذجي بتونس)।

[৬১] ভিন্ন তথ্য অনুসারে হাবিব বুরগিবা ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে লরেইনকে বিয়ে করেন এবং ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে।

১৯৩৮ সালের এপ্রিলে এক গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে ফরাসি পুলিশ তা নির্মমভাবে দমন করে। এর পরপরই হাবিব বুরগিবাকে দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেপ্তার করা হয়।[৬২]

তাঁকে মার্সেই শহরে (Marseille)[৬৩] স্থানান্তরিত করা হয়। এখানে তাঁকে ১৯৪২ সালের ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অন্তরিন করে রাখা হয়। মার্সেই থেকে তাঁকে লিওঁ-এ অবস্থিত কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। লিওঁ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় সেন্ট নিকোলাস দুর্গে। এখানে ফ্রান্সবিরোধী জার্মান শক্তি তাঁর সন্ধান পায়। তারা তাঁকে নিস শহরে[৬৪] নিয়ে যায়। নিস থেকে তাঁকে রোমে স্থানান্তরিত করা হয়। রোম থেকে ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল তাঁকে তিউনিসিয়ায় ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর তিনি স্বেচ্ছা-নির্বাসনের সিদ্ধান্ত নেন এবং ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে কায়রোতে চলে যান।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হাবিব বুরগিবা তিউনিসিয়ায় ফিরে আসেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে নতুনভাবে ফ্রান্সে সফর করেন। সে-সময় তিনি ফরাসি সরকারব্যবস্থা সংস্কারের একটি প্রকল্প পেশ করেন। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারিতে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তার আগে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিউনিসিয়ার জনগণ ফ্রান্সের প্রতি কোনো ধরনের আস্থা পোষণ করে না।

এই বছরের শুরুতেই (১৮ই জানুয়ারি) তিউনিসিয়ায় সশস্ত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। হাবিব বুরগিবাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং এক জেল থেকে আরেক জেলে স্থানান্তর করা হয়। ফরাসি কর্তৃপক্ষ তাঁর আলাপ-আলোচনা শুরু করে। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের জুনের শুরুতে তিনি তিউনিসিয়ায় ফিরে আসেন। জাতি তাঁকে বীরের অভ্যর্থনা জানায়। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা জুন ফরাসি কর্তৃপক্ষ একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই

---

[৬২] ১৯৩৮ সালের ৯ই এপ্রিল তিউনিসে দখলদারদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। ফরাসি পুলিশ বাহিনী এই প্রতিরোধকে পাশবিকভাবে দমন করে। এতে একজন পুলিশ ও ২২ জন আন্দোলনকারী নিহত হন। এই ঘটনায় হাবিব বুরগিবাকে অভিযুক্ত করা হয় ও গ্রেপ্তার করা হয়। ১২ই এপ্রিল তাঁর পার্টিকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়, যদিও তাদের তৎপরতা অব্যাহত ছিল।

[৬৩] ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং ঐতিহাসিক প্রভোঁস প্রদেশের বৃহত্তম শহর।

[৬৪] ফ্রান্সের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত একটি শহর।

চুক্তিতে তিউনিসিয়াকে অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। হাবিব বুরগিবা দেশের স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২০ শে জানুয়ারি সরকার গঠন করা হয়।

রাজতন্ত্র বাতিল ও প্রজাতন্ত্রের ঘোষণার পর ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ শে জুলাই হাবিব বুরগিবাকে প্রজাতন্ত্রী তিউনিসিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি মনোনীত করা হয়। এটা বাদশাহ মুহাম্মদ আল-আমিন বেগকে অপসারণ করার পরের ঘটনা।

হাবিব বুরগিবাকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনীত করার বিষয়টি তিউনিসিয়ায় পুনরায় ক্ষমতাচর্চায় বন্ধ্যা অবস্থা তৈরি করে; তাঁর আইনানুগ বৈধ সময়সীমা শেষ হয়, তারপর তিনি গোটা জীবন রাষ্ট্রপতিই থেকে যান।

বয়সের ভারে হাবিব বুরগিবার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। তারপরও তিনি ১৯৮৭ সালের ৭ই নভেম্বর কার্থেজের প্রাসাদে অবরুদ্ধ হন। যাতে তিনি বিরোধীদের হাতে না পড়েন এই জন্য তাঁকে কয়েক দিন পর এখান থেকে সরিয়ে মুরনাকে নিয়ে যাওয়া হয়। যাইনুদ্দিন বিন আলি ছিলেন মহানিরাপত্তা পরিচালক। তিনি হাবিব বুরগিবাকে সরিয়ে দেন এবং নিজেকে প্রজাতন্ত্রের নতুন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন (৭ই নভেম্বর)। ক্ষমতার এই পালাবদলকে ৭ই নভেম্বরের বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়।

১৯৮৮ সালের ২২ শে অক্টোবর হাবিব বুরগিবাকে মুরনাক থেকে তাঁর জন্মশহর মুনসাতিরে নিয়ে যাওয়া হয়। ২০০০ সালের ৬ই এপ্রিল মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর জন্মশহরেই অবস্থান করেন।

তিউনিসিয়া থেকে ইসলামকে বিলুপ্তকরণ

ইতিহাসের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই যে, তিউনিসিয়া ছিল একটি সমৃদ্ধ দেশ। উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষায় দেশটি ছিল অগ্রগামী। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণকারী আলেম-উলামা, ধর্মপ্রচারক ও সেনাবাহিনীর জন্য এ-দেশ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। তিউনিসিয়ার ওপর ফ্রান্সের দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দখলদাররা ও তাদের অনুসারীরা এই দেশকে ধর্মনিরপেক্ষতার কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে। এই উদ্দেশ্যে তিউনিসিয়ার নেতৃবৃন্দ শিক্ষাব্যবস্থার

প্রত্যেক বিভাগে সামগ্রিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বিস্তারের জন্য বৃহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যাবতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-কেন্দ্রে ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষার পাঠ্যসূচির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই উদ্যোগের বাস্তবায়ন সূচিত হয়। এর প্রভাব আয-যাইতুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরও পড়ে। তারা কয়েকটি দিক থেকে ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষার মৌলিকতার পরিবর্তনের ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। দ্বীনের যেসব বিষয় জানা অত্যাবশ্যক সেগুলোর প্রত্যেকটিতে সন্দেহের বীজ বপনের মধ্য দিয়ে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। যেমন : নবি ও রাসুল, নবুয়ত, নবিগণের নিষ্পাপ হওয়া, ফেরেশতা, কুরআন, সুন্নাহ ইত্যাদি যত গায়বি বিষয় আছে প্রত্যেকটিতে সন্দেহ বপনের তৎপরতা শুরু করে।

শরিয়া ও ইসলামি চিন্তাধারার যা-কিছু ইসলামি রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল তা ঝেটিয়ে বিদায় করা হয়। যেমন : খিলাফত ও সরকারব্যবস্থা। নতুন যে-পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করা হয় তাতে দেখানো হয় যে, ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাস মূলত ক্ষমতার জন্য অন্তহীন লড়াইয়ের ইতিহাস; হত্যা, প্রবঞ্চনা, গদি ও সিংহাসন টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ ও সংগ্রামের ইতিহাস; এমনকি ক্ষমতার জন্য দ্বীনকে ও দ্বীনের গঠন-উপাদানকে জলাঞ্জলিও দেওয়া হয়েছে।

তিউনিসিয়ার স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এমনকি মুসলমানদের জন্যও তাওরাত ও ইঞ্জিলকে পঠন-পাঠনের অন্তর্ভুক্ত করে। তাদের দাবি অনুযায়ী এটা ছিল 'বিশ্বসভ্যতা ও অন্যান্য ধর্মকে মুক্তভাবে জানা' নামে যে-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল তার আওতাধীন।

তিউনিসিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কয়েক বছর ধরে হিব্রু ভাষা শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছিল। পরে সোসা[৬৫] কলেজ ও মানুবা[৬৬] কলেজ সাহিত্য ও মানববিদ্যার জন্য হিব্রু ভাষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। যদিও জায়নবাদী দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধী উচ্চশিক্ষার কয়েকজন শিক্ষক (অধ্যাপক) হিব্রু ভাষাকে অন্তর্ভুক্তকরণের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন।

---

[৬৫] রাজধানী তিউনিস থেকে ১৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি শহর।

[৬৬] তিউনিসিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি শহর।

Contents

হাবিব বুরগিবা ও ইসলামবিরোধী লড়াই

তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরেই হাবিব বুরগিবা তাঁর আসল চেহারা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। ফ্রান্সের সঙ্গে তাঁর উষ্ণ সম্পর্ক ও প্যারিসের প্রতি তাঁর গাঢ় প্রেম দেখা গেল। তিনি পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন এবং ফরাসি বিপ্লবের নীতি ও আদর্শে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে যায়। শার্ল দ্য গোলে[৬৭]র ব্যক্তিত্বে নিমজ্জিত হন। তুর্কি ও আরব ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আধ্যাত্মিক পিতা কামাল আতাতুর্কের প্রতি তাঁর যে-গভীর অনুরাগ সেটাও তিনি গোপন করেননি। বরং তিনি কামাল আতাতুর্ককে তাঁর প্রধান অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ও তাঁর জীবনে আদর্শ মনে করতেন।

কামাল আতাতুর্ক ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্ব হাবিব বুরগিবার মন ও মগজে বদ্ধমূল ছিল। তিউনিসিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি তাঁর সকল প্রচেষ্টা ও সামর্থ্য ব্যয় করেন, তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও মানসিক শক্তি খরচ করেন; একইভাবে তাঁর বক্তৃতার কারিশমা, মেধা ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বকেও কাজে লাগান। তিউনিসিয়ায় আরবি ভাষা ও ইসলামি শিক্ষার যে প্রবণতা ও অনুরাগ ছিল তাও ধ্বংস করার জন্য তিনি সর্বশক্তি ব্যয় করেন। তিনি আলেম-উলামা ও ইসলাম-প্রচারকদের বিতাড়িত করেন, সব ধরনের ইসলামি দলকে নিষিদ্ধ করেন, সমস্ত কলম

---

[৬৭] জেনারেল শার্ল দ্য গল (১৮৯০-১৯৭০) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিজেকে স্বাধীন ফ্রান্সের একমাত্র নেতা হিসেবে ঘোষণা করে ফ্রান্সের নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সূচনা করেন। জেনারেল দ্য গলের এ পদক্ষেপ পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

১৯৪০ সালের ১৪ জুন নাৎসি বাহিনীর হাতে প্যারিসের পতন হয়। নাৎসি আগ্রাসনের মুখে জেনারেল গল ১৯৪০ সালের ১৭ই জুন ফ্রান্স থেকে পালিয়ে ব্রিটেনে চলে আসেন। ফরাসি সরকার ১৮ জুন জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রস্তুতি নেওয়ার প্রাক্কালে তিনি বিবিসি রেডিওতে ফরাসি জাতির উদ্দেশে এক ভাষণ দেন। ঐতিহাসিক এ ভাষণে জেনারেল দ্য গল বলেন, ফরাসি প্রতিরোধের যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়েছে তা কখনই নিভবে না। ভাষণের পরদিন দ্য গলের বক্তব্য সম্বলিত পোস্টারে ছেয়ে যায় যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন শহর।

চূর্ণ করে দেন এবং যারাই তাঁর বিরোধিতা করেছে তাদের সকলের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্ম উৎপীড়ন অব্যাহত রাখেন।

হাবিব বুরগিবা তাঁর নীল নকশা বাস্তবায়নে বেশি দিন অপেক্ষা করেননি। তাঁকে ঘিরে তিউনিসীয় জাতির যে-গর্ব ও মনোযোগ ছিল সেটার ফল তিনি ভোগ করতে শুরু করেন দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই। স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র তিন মাস পরেই তিনি 'মাজাল্লা আল-আহওয়াসুস শাখসিয়্যাহ'[৬৮] নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন। এই সাময়িকীতে তিনি ফরাসি রূপরেখা অনুযায়ী তিউনিসিয়ার সমাজব্যবস্থাকে কীভাবে পুনর্গঠন করা যায় তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রকাশ করতে শুরু করেন। হাবিব বুরাগিবার রাষ্ট্রপতি হওয়ার শুরুর দিনগুলো থেকেই এই সাময়িকী ধারাবাহিকভাবে ইসলাম-বিরোধী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রচার করে।

কিন্তু এ-সকল নীতির কার্যকরী প্রয়োগ ছয় মাসের আগে শুরু হয়নি। অর্থাৎ, ১৯৫৭ সালের শুরুর দিকে এসব নীতির বাস্তবায়ন শুরু হয়। হাবিব বুরগিবা নতুন রীতি-নীতি ও আইন-কানুনের গুরুত্বকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া এবং তিউনিসিয়ার সমাজব্যবস্থার ওপর তার ভবিষ্যৎ প্রভাবকে বিস্তৃত করার জন্য তাঁর সময়ের পূর্ণ সুযোগ এবং প্রচারমাধ্যমে তাঁর বক্তৃতামালা ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর অবস্থানের পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করেন।

হাবিব বুরগিবা রাজনৈতিক বিরোধীদের মোকাবিলায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ মনোভাব ও হিংস্রতা প্রকাশ করেন। এমনকি ফরাসি দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামে যারা তাঁর সহযোদ্ধা ছিল তাদেরকেও তিনি ছাড় দেননি। তাঁর নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রের ওপর একচ্ছত্র অধিকারের ফায়দা নিয়ে তিনি আয-যাইতুনা ইসলামি সংস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। সংস্থাটি ছিল হাবিব বুরগিবার সার্বক্ষণিক প্রতিদ্বন্দ্বী সালেহ বিন ইউসুফের দাঁড়াবার জায়গা। তিনি প্রাচ্যীয় আরব দেশগুলো ও জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছিলেন। হাবিব বুরগিবা যারা 'ইউসুফি' নামে পরিচিত ছিল তাদের বিতাড়িত করেন। কারণ তারা দলের (নিও দস্তুর বা New Constitutional Liberal Party) জেনারেল সেক্রেটারি সালেহ বিন ইউসুফকে সমর্থন জুগিয়েছিল। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে বন্দি করা

---

[৬৮] The Code of Personal Status.

হয় এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। জার্মানে আশ্রিত তাদের নেতাকে গুপ্তহত্যার আগে এই ফাইল বন্ধ হয়নি।[৬৯]

হাবিব বুরগিবা ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিরুদ্ধে যে-অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা হয় তারও সুবিধা গ্রহণ করেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁর বিরোধী ও স্বাধীন সংবাদপত্রগুলোকে বন্ধ করে দেন। জনগণের মৌলিক অধিকারগুলোকে বাতিল করেন। তিনি এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য তিনি এসব কর্মকাণ্ডে তিউনিসিয়ান জেনারেল লেবার ইউনিয়নে[৭০]র সাহায্য গ্রহণ করেন। নিও দস্তুর পার্টির সঙ্গে লেবার ইউনিয়ন জোট গঠন করেছিল, এই পর্যায়ে যে, তারা পার্টির কর্মকাণ্ডে নাক গলাবে এবং পার্টি ও তার নেতৃবৃন্দের ওপর অভিভাবকত্ব ফলাবে।

তিউনিসিয়ার ইতিহাসে যারা ছিল প্রতীক ও আদর্শ তাদের প্রতি হাবিব বুরগিবা ন্যূনতম মর্যাদাও প্রদর্শন করেননি। তিনি তাদের চেহারায় কালিমা লেপন করেন। ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের পাকড়াও করেন, তাদের ঘরছাড়া করেন, তাদের অপমান-অপদস্থ করেন, তাদের কঠিন ও নিকৃষ্ট শাস্তি দেন।

দেশের স্বাধীনতার পর হাবিব বুরগিবা নিজেই রাস্তায় নামেন এবং তাঁর দুই হাত দিয়ে তিউনিসিয়ান নারীদের হিজাব খুলে নেন...তিনি হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনে বলা হয় যে, হিজাব একটি সাম্প্রদায়িক পোশাক, তা সমাজের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিতে মানুষকে প্ররোচিত করে।

হাবিব বুরগিবা তরুণীদের সঙ্গে যুবকদের মেলামেশার জন্য সব ধরনের সুবিধা দান ও সব ধরনের পন্থা ও পদ্ধতি সহজীকরণে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয় করেন। তিনি বেশ্যালয় খোলেন, পানশালায় (মদের বার) অনুদান দেন। তিনি তাঁর প্রচারসংস্থা ও এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব কাজে

---

[৬৯] সালেহ বিন ইউসুফ ১৯৬১ সালের ১২ই আগস্ট জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে গুপ্তহত্যার শিকার হন।

[৭০] الاتحاد العام التونسي للشغل

নিয়োজিত করেন এবং কমিউনিস্ট ও পেশাদার ফ্রাঙ্কোফোন[৭১]দের পরিচালনায় নিজের নামে টেলিভিশন চ্যালেন চালু করেন।

হাবিব বুরগিবা নিজেকে চোর-ছ্যাঁচড় ও নষ্ট-ভ্রষ্ট চেলা-চামুণ্ডা দিয়ে নিজেকে বেষ্টন করে রাখেন। তিনি কুরআনকে বিতাড়িত করেন, মুসল্লিদের ওপর নজরদারি শুরু করেন, দ্বীনদারির ঝরনাগুলোকে শুকিয়ে ফেলেন, শিক্ষাব্যবস্থার পথ ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনেন, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং পূর্বসূরিদের অনুসরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন।

মূলকথা, হাবিব বুরগিবা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; ইসলামের আখলাক-শিষ্টাচার, মূল্যবোধ, আদর্শ ও মূলনীতি ও ইসলামি কার্যাবলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি তিউনিসিয়ার ইসলামি পরিচয় মুছে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি তিউনিসিয়া ও তার মুসলিম জাতিকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন...কেবল ফ্রান্স, ফরাসি দখলদার ও তাদের দোসরদের থেকে নয়; বরং ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকেও।

কামাল আতাতুর্ক যা করেছিলেন তাও ছাড়িয়ে গেলেন হাবিব বুরগিবা। তিনি নিজেকে রাব্বুল আলামিনের (মহান আল্লাহর) প্রতিদ্বন্দ্বী ঘোষণা করলেন। তিনি স্পষ্টভাবে দাবি করলেন যে, কুরআন বৈপরীত্যপূর্ণ ও স্ববিরোধ বিষয় দ্বারা পরিপূর্ণ। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ঠাট্টা-তামাশা করলেন। তিনি আল্লাহর হুকুম-আহকাম পরিবর্তন করতে শুরু করলেন এবং অন্যান্য আইন-কানুন বিধিবদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর দাবি অনুযায়ী, এসব আইন-কানুন ছিল আধুনিক ও যুগোপযোগী, সমাজ ও সমাজের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

[৭১] ফ্রাঙ্কোফোনি (Francophonie) : ফরাসি ভাষায় কথা বলার বৈশিষ্ট্য। ফ্রাঙ্কোফোন (Francophone) : যাঁরা ফরাসি ভাষায় এই বৈশিষ্ট্যসহ কথা বলেন। অর্থাৎ, ফরাসি ভাষার পেশাদার বাচনশিল্পী।

Contents

ইসলামের হুকুম-আহকামের পরিবর্তন

হাবিব বুরগিবা 'কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণে'[৭২]র বৈধতা দিয়ে একটি আইন পাশ করেন। আরেকটি আইন পাশ করেন যাতে বলা হয় যে, স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী পরবর্তী স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হলে প্রথম স্বামী তাকে গ্রহণ করতে পারবে না। তৃতীয় আরেকটি আইন পাশ করেন যা বিচারালয়ের অনুমতি ব্যতীত স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীকে তালাকদান নিষিদ্ধ করে।

হাবিব বুরগিবা নারীদেরকে গর্ভপাতের অনুমতি দেন। এমনকি তিনি স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের অনুমতি ব্যতীত গর্ভপাত করার বৈধতা জারি করেন। পুরুষদের বিবাহ-উপযোগী বয়স বিশ বছর এবং মেয়েদের বিবাহ-উপযোগী বয়স সতেরো বছর পর্যন্ত উন্নীত করেন। বরং তিউনিসিয়া ১৯৬২ সালের ১০ই ডিসেম্বর নিউইয়র্ক কনভেনশনকে অনুসমর্থন করে, এই মর্মে যে ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের ভিত্তিতে কারও প্রতি কোনো ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। এই কনভেনশনের দাবি অনুযায়ী নারীর অধিকার রয়েছে ধর্মের তোয়াক্কা না করে যেকোনো পুরুষকে বিয়ে করার। এই অধিকারে তিউনিসীয় মুসলিম নারীরা অমুসলিম পুরষদেরও বিয়ে করতে পারবে!

'মাজাল্লা আল-আহওয়াসুস শাখসিয়্যাহ' সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে এসব আইন-কানুন প্রকাশিত হয় এবং তিউনিসীয় সমাজে অত্যন্ত বড় ধরনের প্রশ্ন ও আপত্তির জন্ম দেয়। তবে ফরাসি চিন্তা-চেতনা আকণ্ঠ পানকারী হাবিব বুরগিবা অত্যন্ত হিংসার সঙ্গে ও রক্তাক্ত পন্থায় এ-সকল প্রশ্ন ও আপত্তির জবাব দেন। তিনি এ-দিকে তাকাননি যে, তিউনিসিয়ার সংবিধান ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বিবেচনা করে। তিনি জাতির আবেগ-অনুভূতি

---

[৭২] আরবি التبنى শব্দের অর্থ কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা, কাউকে দত্তক নেওয়া। কিন্তু দত্তক নেওয়ার অর্থ ব্যাপক; এতিম ও অনাথ শিশুদের নিজের পরিবারের সঙ্গে লালনপালনও দত্তক নেওয়া বোঝায়। ইসলামে এ-ধরনের কাজকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম যা নিষিদ্ধ করেছে তা হলো কারও প্রকৃত পিতাকে অস্বীকার করে তাকে অন্য মানুষের সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। অথচ তিউনিসিয়ার আইন এ-বিষয়টাকেই বৈধতা দিয়েছে।

নিয়ে এমনভাবে খেলা শুরু করেন যে-খেলা জাতি ফরাসি দখলদারদের থেকেও দেখেনি!

১৯৬৫ সালে হাবিব বুরগিবা তিউনিসিয়ার জনগণের জন্য রোজা নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানান, এমনকি রমজান মাসেও রোজা নিষিদ্ধ করতে বলেন। তাঁর দাবি ছিল, রোজা উৎপাদন কমিয়ে দিচ্ছে এবং তিউনিসিয়ার অগ্রযাত্রা ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

এমনকি তিউনিসিয়ার নেতাদের পরিকল্পনায় নামাজও অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তিউনিসিয়ার জনমণ্ডলী থেকে ইসলামের নাম-নিদর্শন ও আরবি ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে মুছে দেওয়া। তারা নামাজকে এবং নামাজের প্রতি আহ্বান ও উদ্বুদ্ধ করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করে।

আসরের নামাজের সঙ্গে জুমার নামাজকে একত্রীকরণ!

রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন করা হয় যে, শুক্রবারের পরিবর্তে শনিবার হলো সাপ্তাহিক ছুটি। তিউনিসিয়ার নাগরিকেরা তাদেরকে জুমার নামাজ থেকে বঞ্চিত করার ফলে অসুবিধা ও যন্ত্রণার শিকার হন। এই পরিস্থিতিতে হাবিব বুরগিবা কতিপয় শায়েখ কর্তৃক প্রদত্ত ফতোয়ার আশ্রয় নেন। তাঁরা ফতোয়া দেন যে, জুমার নামাজ ও আসরের মধ্যে একত্রীকরণ জায়েজ আছে। অর্থাৎ, আসরের নামাজের সঙ্গে জুমার নামাজও আদায় করা যাবে। এই ফতোয়ার প্রেক্ষিতে জুমার দিন মসজিদগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগের মসজিদগুলোতে সময়মতো নামাজ আদায় করা হবে এবং দ্বিতীয় ভাগের মসজিদগুলোতে আসরের নামাজ আধা ঘণ্টা পিছিয়ে আনা হবে, যাতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আসরের নামাজের সঙ্গে জুমার নামাজও আদায় করতে পারেন।

শুধু এটাই নয়, জুমার সমস্ত খুতবা সরকারের পক্ষ থেকে লিখিত আকারে বিলি করা হতো এবং সব মসজিদে একই খুতবা পঠিত হতো। খতিবদের জন্য আবশ্যক ছিল এই খুতবা পাঠ করা। অন্যথায় তাদের জবাবদিহি করতে হতো। এসব খুতবার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল রাস্তায় চলাচলের কায়দা-কানুন অর্থাৎ ট্রাফিক ও পথচারী আইন। যাতে মানুষ অনভিপ্রেত ভয়ংকর দুর্ঘটনা এড়াতে পারে, যা গ্রীষ্মকালীন অবকাশে বেড়ে যায়।

খুতবার আরও আলোচ্য বিষয় ছিল দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে কীভাবে ভ্রমণ করা যায় তার খোঁজ-খবর; সড়কে, বাগানে ও পার্কে ফুল সুরক্ষার গুরুত্ব। রাষ্ট্রপতি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশ অফিসারদের জন্য কল্যাণের দোয়ার মধ্য দিয়ে খুতবাগুলো শেষ হতো!

তিউনিসিয়ার সব মসজিদ আরও একটি ভয়ংকর আইনের শিকার হয়। এই আইনের আওতায় মসজিদগুলোকে কেবল নামাজের সময় মুসল্লিদের সামনে খুলতে হতো এবং নামাজের পরপরই বন্ধ করে দিতে হতো। যারা এই আইন বাস্তবায়নে নিয়োজিত ছিল তারা কোনো মুসল্লিকে নামাজের পর মসজিদের ভেতরে সামান্যতম বসারও সুযোগ দিত না। একইভাবে মসজিদের অভ্যন্তরে যেকোনো ধরনের মজলিশ বা সমাবেশ তা যে-নামেই হোক আর যে-কারণেই হোক নিষিদ্ধ ছিল।[৭৩]

হিজাব যখন অপরাধ

তিউনিসিয়া পর্দা ও হিজাব ধ্বংস করে দেওয়ার অসংখ্য মরিয়া প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করেছে। এর কারণ ছিল সত্তরের দশকে উচ্ছ্বসিত ইসলামি জাগরণ। ১৯৮১ সালে হাবিব বুরগিবা একটি আইন জারি করেন। এই আইন 'সার্কুলার নং ১০৮' নামে পরিচিত ছিল। এই আইনে হিজাবকে সাম্প্রদায়িক পোশাক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সরকারি এজেন্সিসমূহ মসজিদের ইমাম সাহেবদেরকে একটি প্রচারপত্র বিলি করে, এতে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা হয় যে, তাঁরা যেন হিজাব ত্যাগ করার ব্যাপারে নারীদের সাহস ও উৎসাহ জোগান এবং ঘোষণা করেন যে, হিজাব ও পর্দা দ্বীনে ইসলামের কিছুই নয়।

হাবিব বুরগিবা আরও বলেন, হিজাব একটি সাম্প্রদায়িক পোশাক যা সমাজে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করবে। যদিও তিউনিসিয়ার জনমণ্ডলীর শতকরা ৯৮ ভাগ মুসলমান, ১ ভাগ খ্রিষ্টান এবং ইহুদির সংখ্যা ১ ভাগেরও কম!

---

[৭৩] দেখুন : تونس الحديثة وصراع الهوية, উমর আন-নামিরি, আল-বায়ান, জিলহজ, ১৪২১, মার্চ ২০০১, সংখ্যা ১৬০, পৃষ্ঠা ১২৯-১৩৫।

তিউনিসিয়ার ধর্মমন্ত্রী আবু বকর আল-আখযুরী অসংখ্যবার হিজাবকে আক্রমণ করেন। তিনি হিজাবকে তিউনিসিয়ার সমাজে অনুপ্রবেশকারী ও অস্বাভাবিক সতীত্ব-প্রবণতা বলে আখ্যায়িত করেন। আল-আখযুরি হিজাবকে সাম্প্রদায়িক পোশাক আখ্যা দিয়ে বলেন, যে-নারী হিজাব পরিধান করবে সে পরিচিত ও স্বাভাবিক রীতিনীতি থেকে বেরিয়ে যাবে। তিনি হিজাবকে অদ্ভুতদর্শন বস্তু বিবেচনা করেন যা তিউনিসিয়ার সমাজকে পশ্চাদ্‌পদতার দিকে টেনে নিয়ে যাবে!

পুলিশ সদস্যরা রাস্তা থেকে হিজাব-পরিহিতা নারীদেরকে বিতাড়িত করতে উঠেপড়ে লাগে। যেসব নারী হিজাব পরিধান করেন তাদেরকে সরকারি কর্মক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ঘরে বা পরিবারে কোনো হিজাব-পরিধানকারী মেয়ে বা নারী থাকলে স্বামীদের ও বাবাদের জবাবদিহি করতে হতো। এমনকি হিজাব-পরিহিতা নারীর সরকারি হাসপাতালগুলো সন্তানও প্রসব করতে পারত না!

উপর্যুক্ত অন্যায় ও অপরাধমূলক আইনের সমর্থনে ১৯৮৬ সালে আরেকটি আইন জারি করা হয়। এটি 'আইন-১০২' নামে পরিচিত ছিল।

এই আইন লঙ্ঘনের ফলে শতশত দ্বীনদার নারী ও তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করা হয়। তাদের আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়; সেখানে তাদের ইসলামি পোশাক পরতে দেওয়া হয়নি, নামাজও আদায় করতে দেওয়া হয়নি। এসব কারণে বহু নারী স্নায়বিক বৈকল্যের শিকার হন। এ-ব্যাপারে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সাক্ষ্য রয়েছে।[৭৪]

---

[৭৪] দেখুন : সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, নথি নং ৩০/০২/৯৩, তারিখ : ৩০ শে জুন, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ।

হাবিব বুরগিবার শাসনামলে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করতে যেসব আইন পাস করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

১। পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। বিবাহিত অবস্থায় ও বিদ্যমান স্ত্রী থেকে বিবাহবিচ্ছেদের পূর্বে কেউ বিবাহ করলে তার শাস্তি হলো এক বছর কারাদণ্ড ও দুই লাখ চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্ক জরিমানা অথবা এর কোনো একটি দণ্ডিত করা। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, তিউনিসিয়ার যে-আইন একাধিক বিবাহের জন্য শাস্তি বিধান করছে সেই একই আইন ব্যভিচারের বৈধতা দিচ্ছে, অথচ এর জন্য কোনো শাস্তি প্রয়োগ করছে না। উল্লেখ্য যে, তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা-বিপ্লবের পরপরই ১৩৭৬ হিজরিতে/ ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এ-আইন জারি করা হয়েছিল।

২। তিউনিসিয়ার সরকার ১৩৭৭ হিজরির ১৮ই শাবান/ ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ 'কাউকে[৭৫] সন্তানরূপে গ্রহণ করা'কে বৈধতা দিয়ে একটি আইন জারি করে। যিনি কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করবেন তিনি নারী বা পুরুষ হতে পারেন; তবে তাঁকে সততাপরায়ণ, নাগরিক অধিকারগুলোর ভোক্তা ও বিবাহিত হতে হবে। অথচ এটা জানা কথা যে, 'কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা'[৭৬] নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সকল ইসলামি মাযহাবের ঐকমত্য রয়েছে।[৭৭]

৩। শরয়ি বিচারব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা হয়। শরিয়া মোতাবেক পরিচালিত দপ্তরগুলো বন্ধ করে দেওয়া এবং তিউনিসীয় বিচারব্যবস্থাকে একীভূত করা হয়।[৭৮]

৪। জামে আয-যাইতুনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এটি ছিল সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৭০ হিজরিতে/১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে একটি সরকারি নির্দেশের দ্বারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামি শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়।

---

[৭৫] তার আসল পিতাকে অস্বীকার করে।

[৭৬] আসল পিতাকে অস্বীকার করে।

[৭৭] দেখুন : মাজাল্লা আল-আহওয়াসুস শাখসিয়্যাহ।

[৭৮] দেখুন : আর-রায়িদু আর-রাসমি, আল-জামহুরিয়্যাতুস তিউনিসিয়্যাহ, সংখ্যা ৭৭

৫। জামে আয-যাইতুনা (বিশ্ববিদ্যালয়), এর ছাত্রবৃন্দ ও আলেমগণের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত ও শরয়িভাবে ধার্যকৃত সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ-ছাড়া অন্যান্য মসজিদ ও জনকল্যাণমূলক সংস্থার (এনজিও ইত্যাদি) সম্পদও বাজেয়াপ্ত করা হয়। এমনকি কিছু কিছু ছোট মসজিদকে ভান্ডার ও মজুদাগারে রূপান্তরিত করা হয়।[৭৯]

৬। তিউনিসিয়ার পরিবারপ্রথা ভেঙে পড়ে এবং পারিবারিক বন্ধনগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। গার্ডিয়ানশিপ বা অভিভাবকত্বকে বাতিল করে কয়েকটি আইন জারি করার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়। এসব আইনে পুরুষের অভিভাবকত্ব নারীর জন্য অপমানকর বিবেচনা করা হয়; পিতৃসুলভ কর্তৃত্ব সীমিত করা হয়, চারিত্রিক ও নৈতিক ব্যাপারগুলো বিবেচনায় না এনে জীবনযাত্রায় নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ করা হয়। শুধু তা-ই নয়, কেউ যদি তার স্ত্রীকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখে এবং আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়ে তার ঘরে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত পুরুষকে হত্যা করে ফেলে, তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হয়।

৭। মসজিদে কুরআনি হালকা ও ইলমি দরস নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা হয়। সরকার এই আইন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মসজিদ পাহারা দেওয়ার জন্য আলাদা পুলিশ বিভাগ খোলে। ফলে প্রত্যেক নামাজের সময় মাত্র বিশ মিনিটের জন্য মসজিদগুলো খোলা হতো। নামাজের পরপরই পুলিশ সদস্যরা মসজিদ খালি করতে শুরু করত এবং মুসল্লিদের তাড়িয়ে দিত।

৮। মসজিদে যুবক শ্রেণির নামাজের সযত্ন অনুশীলন উগ্রবাদিতার দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। তাদেরকে অহেতুক ও অকারণে কোনো অবৈধ সংস্থা বা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। ফলে মসজিদগুলো বিরান হয়ে পড়ে এবং যুবক মুসল্লিদের থেকে সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায়।

৯। সর্বস্তরের মানুষের জন্য তিউনিসিয়ার সকল শহরে, মফস্বলে, গ্রামে ও গঞ্জে নারী-পুরুষের যৌথ ড্যান্স ক্লাব খোলা হয়। তরুণ-তরুণীদেরকে

---

[৭৯] দেখুন : تونس.. الإسلام الجريح, মুহাম্মদ আল-হাদি মুস্তাফা যামযি, পৃষ্ঠা ৪৮।

এসব ড্যান্স ক্লাবে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাদের বাধা দিলে পরিণাম ভালো হবে না বলে তাদের অভিভাবকদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা হয়।

১০। জাদুবিদ্যা, মায়াবিদ্যা ও ভাগ্যগণনা ইত্যাদি প্রচার-প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এতে মূলত গণক ও জাদুবিদ্যার কুশীলবদের অফিস খোলা এবং তাদের প্রচারপত্র সংবাদমাধ্যম ও সাময়িকীতে প্রকাশের অনুমোদন দেওয়া হয়। এসব ব্যাপার মানুষের অন্তরে তাওহিদের আকিদা ও বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দেয়।[৮০]

সরকার ছেলে-মেয়েদের একত্রে পাঠদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়-শহর খুলতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে তিউনিসিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জৈবিক ও চারিত্রিক দুর্যোগ ঘটতে থাকে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্টগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রকাশ্যে কনডম বিতরণ করে।

১১। তিউনিসিয়ায় জায়নবাদী আন্দোলন ও ইহুদি ধর্মে দীক্ষিতকরণ উৎসাহ ও প্রণোদনা পায়। এটা শুরু হয় তিউনিসিয়ার শাসকদের জায়নবাদী জাতিরাষ্ট্রের (ইসরাইলের) স্বীকৃতি ও এই জাতিরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন-কানুন ও প্রচারমাধ্যমে তাদের প্রভাবকে জবরদস্তিমূলক স্বাভাবিকীকরণের মধ্য দিয়ে।

১২। নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতার তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। জন-সমাবেশ, সরকারি বৈঠকগুলোতে ও সাহিত্য-সাময়িকীতে পবিত্র নিদর্শন ও বিষয়ের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়। এ-সবকিছু ঘটে সরকারের আনুকূল্যে।

সবচেয়ে ভয়ংকর যে-ব্যাপারটি ঘটে তা ঘটান হাবিব বুরগিবা নিজেই। তিনি ১৩৯৪ হিজরিতে/১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এক সাধারণ সম্মেলনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, কুরআন স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ এবং এতে রয়েছে নানা ধরনের রূপকথা। তা ছাড়া তিনি নবি করিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৮০] দেখুন : تونس.. الإسلام الجريح, মুহাম্মদ আল-হাদি মুস্তাফা যামযি, পৃষ্ঠা ৩৪১-৩৪৪।

ওয়াসাল্লাম-এর ওপর এমনসব গুণাবলি আরোপ করেন যা তার শানের উপযোগী নয়।

পরবর্তী সময়ে এই ভাষণ ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। এই ভাষণের প্রভাব ছিল তীব্র; বরং এই ভাষণ পরিচিত সকল অর্থেই একটি ভয়াবহ দুর্যোগ বিবেচিত হয়।

সেই সময় শায়খ আবদুল আযিয বিন বায (তৎকালীন গ্র্যান্ড মুফতি, সৌদি আরব) হাবিব বুরগিবার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'যেকোনো মুসলমান এই বক্তৃতা পড়েছে বা শুনেছে তা তাকে শঙ্কিত ও আতঙ্কিত করেছে। কারণ, এই বক্তৃতায় রয়েছে স্পষ্ট কুফরি; আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দুঃসাহসিক বিরুদ্ধাচরণ। অথচ তা এমন একটি রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল নেতার পক্ষ থেকে যেটাকে মুসলিম রাষ্ট্র বলা হয়।'[৮১]

ইসলামি বিশ্বের বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত আলেম হাবিব বুরগিবার সঙ্গে পত্রযোগাযোগ করে তাঁর কাছে উপর্যুক্ত ভাষণের জন্য ক্ষমা ও জবাবদিহি দাবি করেন এবং একই কারণে তাঁকে নতুনভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন এবং তিনি যা বলেছেন তার ওপর গোঁ ধরে থাকেন।

যাঁদের পক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে পত্রযোগাযোগ করা হয়েছিল তাঁরা হলেন :

১. শায়খ আবুল হাসান আলি নদবি, আমিনুল উলামা, ভারত
২. শায়খ আবদুল আযিয বিন বায, গ্র্যান্ড মুফতি, সৌদি আরব
৩. শায়খ হুসাইন মাখলুফ, গ্র্যান্ড মুফতি, মিসর
৪. শায়খ আবু বকর জুমি, প্রধান বিচারপতি, নাইজেরিয়া
৫. ড. মুহাম্মদ আমিন আল-মিসরী, অধ্যাপক, বাদশাহ আবদুল আযিয বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা মুকাররমা

হাবিব বুরগিবাকে লিখিত তাঁদের পত্রে যে-বক্তব্য ছিল তার সারমর্ম নিম্নরূপ:

---

[৮১] আল-ফাতাওয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৪।

"আপনাদের অবশ্য কর্তব্য হলো অতিদ্রুত তওবা করা এবং ইসলামে ফিরে আসা। অন্যথায় আপনাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো স্পষ্টভাবে আপনাদের বক্তব্যকে অস্বীকার (প্রত্যাহার) করা এবং তা যত ধরনের প্রচারমাধ্যম আছে তার দ্বারা গোটা বিশ্বে প্রচার করা। আপনারা যদি আপনাদের বক্তব্য অস্বীকার (প্রত্যাহার) না করেন, তার অর্থ হলো আপনারা ধর্মদ্রোহিতা-ধর্মত্যাগের ওপরই অটল রয়েছেন এবং এমন ফেতনা ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছেন যার পরিণাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ছাড়া কেউ জানেন না।"

কিন্তু হাবিব বুরগিবা অস্বীকৃতি জানান এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন। ইসলামি বিশ্বের পত্র-পত্রিকাগুলোতে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাখ্যানে যে-আগুন জ্বলে ওঠে সে-সম্পর্কে তিনি যেন কিছু শুনতেই পাননি। কেবল আরব কমিউনিস্টরা ও মুনাফিক নারী-পুরুষেরা হাবিব বুরগিবার বক্তৃতাকে স্বাগত জানায়। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন :

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾

"মুনাফিক নারী-পুরুষেরা একে অপরের অনুরূপ। তারা অসৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজ নিষেধ করে।"[৮২]

এগুলোই ছিল আধুনিক তিউনিসিয়ার রূপকার, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী তিউনিসিয়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকারী, সবুজ তিউনিসিয়ায় ফরাসি ভাবধারার ও পাশ্চাত্যকরণের রাজনীতির নেতা, হিজাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পতাকাধারী ও এই যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলনকারী হাবিব বুরগিবার কিছু অর্জন। তিনি যে-যুদ্ধ শুরু করেছিলেন বর্তমান সময়ে চরম ও চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আমরা এখনো আছি; কিন্তু হাবিব বুরগিবা মারা গেছেন, তাঁর পূর্বে যে কামাল আতাতুর্ক ছিলেন তিনিও মারা গেছেন। তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের উত্তরসূরিরা এসেছে, যারা লৌহদণ্ড ও আগুনের সাহায্যে তাঁদের উত্তরাধিকার ও আইন-কানুন সুরক্ষিত রাখার জন্য কাজ করে গেছে।

সকল অভিযোগ-অনুযোগ আল্লাহ তাআলার কাছে।

---

[৮২] সুরা তাওবা : আয়াত ৬৭।

Contents

যাইনুল আবেদিন বিন আলি
তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতি

২৩ বছর এক স্বৈরাচারীর রাজত্বকাল। স্বৈরাচারীর চলে যাওয়ার পর কোনো বন্ধু তাঁর জন্য কাঁদেনি, কোনো মিত্র তাঁর জন্য চোখের জল ফেলেনি। ১৯৮৭ সালের ৭ই নভেম্বর থেকে ২০১১ সালের ১৪ই জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে ছিলেন। এই শাসক সবুজ তিউনিসিয়াকে জুলুম ও অন্যায়ের দ্বারা টইটম্বুর করে ফেলেছিলেন। তিনি তাঁর আগের শাসকের চেয়ে ভালো কিছু ছিলেন না। এই লোকটার কাহিনিই আমি এখন বর্ণনা করব।

তিনি হলেন যাইনুল আবেদিন বিন আলি, গণপ্রজাতন্ত্রী সবুজ তিউনিসিয়ার দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট। তিনি ১৯৩৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর সোসার হাম্মাম শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিউনিসিয়া তখন ফরাসি দখলদারদের জোয়ালের নিচে ছিল।

যাইনুল আবেদিন বিন আলি মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায় ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলনে যুক্ত হন। এ-অপরাধে গ্রেপ্তার হন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তাঁকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। ফলে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে সোসা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন এবং এ-প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রফেশনাল সার্টিফিকেট অর্জনে ব্যর্থ হন। ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নবগঠিত তিউনিসিয়া সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। যাইনুল আবেদিন ফ্রান্সের École spéciale militaire de Saint-Cyr মিলিটারি কলেজ থেকে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। এরপর ফ্রান্সের Châlons-sur-Marne-এ অবস্থিত আর্টিলারি স্কুল ডিগ্রি অর্জন করেন।

যাইনুল আবেদিন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং তিউনিসিয়ান স্টাফ অফিসার হিসেবে সেনাবাহিনীতে কর্মজীবন শুরু করেন। এ-বছরই তিনি সামরিক নিরাপত্তা

বিভাগ (মিলিটারি সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট) প্রতিষ্ঠা করেন এবং দশ বছর এই বিভাগের পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এ-সময় কিছুদিনের জন্য তিনি মরক্কো ও স্পেনে অবস্থিত তিউনিসিয়া দূতাবাসে মিলিটারি এটাশে (রাষ্ট্রদূতের সামরিক সহযোগী) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার মহাপরিচালক পদে নিযুক্ত হন।

তিনি ১৯৮০ সালে পোল্যান্ডে তিউনিসিয়ার রাষ্টদূত পদে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে তিনি পুনরায় জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার মহাপরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৮৫ সালে তিনি তিউনিসিয়ার নিরাপত্তা মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিন আলি ১৯৮৬ সালে সমাজতান্ত্রিক দস্তুর পার্টির (Socialist Destourian Party) পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য এবং এই পার্টির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন। পরবর্তী সময়ে এই দলের সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন।

রশিদ সিফ্‌র যখন সরকারের প্রধানমন্ত্রী[৮৩] তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। রশিদ সিফ্‌র ১৯৮৭ সালে তাঁকে ফার্স্ট মিনিস্টার পদে নিযুক্ত করেন। একইসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও তাঁর হাতে থাকে।

১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে যাইনুল আবেদিন বিন আলি প্রধানমন্ত্রী[৮৪] হন। তখন তিউনিসিয়ার ইতিহাসের অত্যন্ত নাজুক সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে, বিশেষ করে ইসলামপন্থীদের সঙ্গে হাবিব বুরগিবার সরকারের রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলছিল।

শ্বেত বিপ্লব বা ৭ই নভেম্বরের বিপ্লব

যাইনুল আবেদিন বিন আলি তিউনিসিয়ার নিরাপত্তার দৃশ্যপটগুলো ছাড়া আর কোথাও পরিচিত ছিলেন না। তিনি তিউনিসিয়ার নিরাপত্তা সংস্থাগুলোতে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পদোন্নতি পান এবং খুব সহজেই

---

[৮৩] ৮ই জুলাই, ১৯৮৬- ২রা অক্টোবর, ১৯৮৭।

[৮৪] ১৯৮৭ সালের ২রা অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত মাত্র ১মাস পনেরো দিন তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ৭ই নভেম্বরের বিপ্লবের পরে তিনি প্রেসিডেন্ট হন।

Contents

হাবিব বুরগিবার আস্থাভাজন হতে সক্ষম হন। হাবিব বুরগিবা তাঁকে অধিকাংশ সময় ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক পদগুলোতে নিযুক্তি দেন।

১৯৮৭ সালের ৭ই নভেম্বর। তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট হাবিব বুরগিবা বার্ধক্যে পৌঁছে গেছেন। তখন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের লোভ প্রধানমন্ত্রী জেনারেল যাইনুল আবেদিন বিন আলির মন ও মগজ, বুদ্ধি ও চিন্তাকে প্ররোচিত করে তোলে। তিনি হাবিব বুরগিবার বিরুদ্ধে নীরব বিপ্লব ঘটনা এবং তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তার আগে বিন আলি তিউনিসিয়ার প্রখ্যাত চিকিৎসকদের থেকে ডাক্তারি প্রত্যয়নপত্র আদায় করে প্রমাণ করেন যে, হাবিব বুরগিবা দেশ পরিচালনায় সক্ষম নন। এর ফলে বিন আলি তিউনিসিয়ার সংবিধান অনুযায়ী দেশের ক্ষমতার লাগাম নিজের মুঠোয় পুরে নেওয়ার অধিকার লাভ করেন এবং ১৯৫৬ সালে দেশটির স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পরে গণপ্রজাতন্ত্রী তিউনিসিয়ার দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট হন।

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি

যাইনুল আবেদিন বিন আলি তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরপরই তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতাটি প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংশোধন আনয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। এই বক্তৃতার ফলে তিউনিসীয় জাতির বিপ্লবী চেতনা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। দেশটির স্বাধীনতার পর থেকেই এ-বিপ্লবী চেতনা একটি সুস্থ পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক জীবনের প্রতীক্ষায় ছিল। বিন আলির শাসনের প্রথম পর্ব রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে উন্মুক্ত সুযোগ দান এবং গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক বহুত্ববাদের সূচনার মধ্য দিয়ে চমক দেখায়।

তা সত্ত্বেও, যাইনুল আবেদিন বিন আলি তাঁর শাসনের শুরুর দিনগুলোতে—বিশেষ করে ১৯৮৮ সালের মার্চের বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, তিনি নারী ও পর্দার প্রশ্নে হাবিব বুরগিবার পথই আঁকড়ে ধরে থাকবেন। বরং তিনি হিজাব পরিধানকারী নারীদের হয়রানি ও হেনস্থায় দ্বিগুণ মাত্রা যোগ করেন। আমি ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু তিউনিসীয় নাগরিকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাঁদের সবাই উল্লেখ করেছেন যে, তিউনিসিয়ার নারীরা হিজাব পরিধান করতে পারেন না। হিজাব পরিধান

Contents

করলে তাদের হুমকি-ধমকি ও অপমান-অপদস্থতার শিকার হতে হয়। নারীরা উমরা বা হজ করতে গেলে তাঁদের বহনকারী উড়োজাহাজ তিউনিসিয়ার ভূমি থেকে উড্ডয়ন করলে তাঁরা হিজাব পরিধান করেন এবং ফেরার সময় তিউনিসিয়ার ভূমিতে উড়োজাহাজ অবতরণের আগেই হিজাব খুলে ফেলেন। এই কাহিনি আমি নিজে শুনেছি; সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকা তিউনিসিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের অনেকেই আমাকে এই কাহিনি বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে আমি যা-কিছু দেখেছি, তিউনিসিয়ানদের মধ্যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত বিস্ময়কর অবস্থা দেখেছি। ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা করেন যে, তাঁদের কন্যারা উঠতি বয়সে পৌঁছলে তাঁরা নিজ দেশে ফিরে আসবেন। যাতে ইউরোপীয় সমাজে তাদের কন্যারা চারিত্রিকভাবে নষ্ট না হয়ে পড়ে। কিন্তু আমি অসংখ্য তিউনিসীয় পরিবারকে দেখেছি, তাঁদের কন্যারা উঠতি বয়সে পৌঁছলেই তাঁরা ইউরোপ বা আমেরিকায় চলে গেছেন। যাতে তাঁরা এমন পরিবেশ পান যেখানে তাঁদের কন্যারা হিজাব পরিধান করতে পারে!

এই যে বিপরীতমুখী অবস্থা, তা মোটেই বোধগম্য নয়। কিন্তু এটাই সত্য ও বাস্তবিক!

যাইনুল আবেদিন বিন আলির শাসনামলে ১৯৮৯ সালে সর্বপ্রথম আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সরকারি দল ৮০.৭% ভোট পায়। অর্থাৎ, পার্লামেন্টের ১৮৯টি আসনের মধ্যে ১৪১টি আসনেই তারা জয়ী হয়। ফলে বিন আলি ১৯৮৯ সালে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত হন। এই নির্বাচনে তিনি একাই প্রার্থী হয়েছিলেন।

স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র

আশির দশকের শেষের দিকে তিউনিসিয়া ইসলামপন্থীদের এবং যা-কিছু সাধারণভাবে ইসলামি নাম ধারণ করে আছে তার বিরুদ্ধে এক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে। বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতার মুখে এই যুদ্ধ অব্যাহতভাবে এগিয়ে যেতে পারে না। এ-সময় খুব দ্রুতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নতুন প্রেসিডেন্ট (বিন আলি) একজন ম্যানিপুলেটর (চতুর কৌশলে ও অসৎ পন্থায় একচেটিয়া ক্ষমতাচর্চাকারী); তিনি একটিও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা

রক্ষা করেননি। তিনি দেশটির রাজনৈতিক শ্রেণি ও তাঁর বিরোধী দলগুলোকে এমনভাবে কোণঠাসা করে ফেলেন যে, মনে হয় হাবিব বুরগিবা এবং যাইনুল আবেদিন বিন আলি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কারণ অর্জিত পরিবর্তন রাজনৈতিক পন্থায় এগোয়নি। পুরোনো ব্যক্তিরা ও চেহারাগুলো ঘুরে-ফিরে আসে; তারা কমেও না, বাড়েও না। যে-গণতন্ত্রের অঙ্গীকার করেছিলেন যাইনুল আবেদিন বিন আলি তা ক্ষমতাসীন দস্তুর পার্টি ও এর কক্ষপথে যারা ঘুরপাক খাচ্ছে তাদের একচেটিয়া ব্যবসার কাঁচামাল হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষমতা থেকে হাবিব বুরগিবার অপসারণ ছিল শাসনব্যবস্থার সুরক্ষার জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের একটি পর্যায়; ফলে শাসনব্যবস্থাকে ভেঙে পড়ার ঝুঁকিসমূহ থেকে দূরে ও নিরাপদ রাখার জন্য এমন একজন ব্যক্তিকে কুরবানি করা হয় যাকে রোগ-ব্যাধি প্রায় শেষই করে দিয়েছিল।

তাঁকে অপসারণের ওপর ভিত্তি করে যে-পরিবর্তন সূচিত হলো তা ছিল অবয়বগত পরিবর্তন, মৌলিক না। এ-কারণে নতুন যুগেও তিউনিসিয়ায় রাজনৈতিক বিপর্যয় ও দুর্যোগ স্বস্থানেই আবর্তিত হতে থাকে। সেই ফলশূন্য শুষ্ক বছরগুলোর পরিক্রমায় কোনো পার্লামেন্টারি নির্বাচনও হয়নি, কোনো প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনও হয়নি। যাইনুল আবেদিন বিন আলি ১৯৯৪ সালে, তারপর ১৯৯৯ সালে, তারপর ২০০২ সালে তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। এরপর তিনি সাংবিধানিক সংশোধন আনেন। ফলে ২০০৪ সালে নতুন মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হতে সক্ষম হন। তিনি ৯৪.৪% ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। পঞ্চম বারের মতো প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য ২০০৯ সালে আবারও প্রার্থী হন। ভোটারদের ৮৯.৬২% ভোট পেয়ে তিনি বিজয়ী হন।

যাইনুল আবেদিন বিন আলি যতদিন ক্ষমতার লাগাম নিজের মুঠোয় পুরে রেখেছিলেন সে-সময়টা ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উত্তেজনার; বিশেষ করে ইসলামপন্থা নিয়ে উত্তেজনা ছিল অত্যন্ত বেশি।

Contents

তিউনিসিয়ায় ইসলামপন্থা[৮৫]

এ-কথা বলা যায় যে, তিউনিসিয়ার ইসলামি আন্দোলন কায়রাওয়ান ও জামে আয-যাইতুনার মতোই প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী। জামে আয-যাইতুনা তিউনিসিয়ার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিউনিসিয়ায় ইসলামি পরিচয় ও আরবি ভাবধারার সুরক্ষায় এই প্রতিষ্ঠান অশেষ অবদান রেখেছে। জামে আয-যাইতুনা ফরাসি ঔপনিবেশিক শক্তির মুখোমুখি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। এই দখলদার শক্তি তিউনিসিয়াকে ফ্রান্সের একটি ভূখণ্ডে রূপান্তর করতে এবং পাশ্চাত্যকরণ ও ফরাসি ভাবধারায় টেনে নিয়ে যেতে প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিল।

অনুরূপ বলা যায় যে, তিউনিসিয়ার ইসলামি আন্দোলনের ইতিহাস হলো হাবিব বুরগিবা ও বিন আলির বিরুদ্ধে লড়াই ও দ্বন্দ্বের ইতিহাস। এই দুটি লোকের শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল একনায়কতান্ত্রিকতা এবং ইসলাম ও ইসলামের নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করা; ইসলামপন্থীদের হত্যা, দেশান্তর ও কারাগারে নিক্ষেপ করার মধ্য দিয়ে তাদের ধ্বংসসাধন ও তাদের থেকে মুক্তি লাভ করা।

তিউনিসিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্রে চূড়ান্ত ডানপন্থা থেকে শুরু করে চূড়ান্ত বামপন্থা পর্যন্ত বিভিন্ন দলীয় ও রাজনৈতিক ভাবধারার তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছিল। রাজনৈতিক মানচিত্র তিউনিসিয়ার ইসলামি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য ও বৈভিন্ন্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল। এসব ইসলামি আন্দোলনের মধ্যে ছিল ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'আন-নাহদা'। রাশিদ আল-গানুশি ও আবদুল ফাত্তাহ মুরু যখন এই সংগঠন প্রতিষ্ঠান করেন তখন তিউনিসিয়ায় এটি জামায়াতে ইসলামি নামে পরিচিত হয়। সংগঠনটি ছিল বৈশ্বিক ইসলামি আন্দোলনের স্বাভাবিক সম্প্রসারিত অংশ। বৈশ্বিক ইসলামি আন্দোলনের পুরোধা ছিল ইখওয়ানুল মুসলিমিন।

---

[৮৫] বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : الحركة الإسلامية في تونس من الثعالبي وإلى يحي أبو زكريا, الغنوشي, পৃষ্ঠা ৫৩-৮২।

তিউনিসিয়ার আন-নাহদা ইসলামি আন্দোলন

১৯৭০ সালে জামায়াতে ইসলামি নামে এই আন্দোলনের সূচনা ঘটে। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে গোপনীয়তার সঙ্গে তাদের সাংগঠনিক বৈঠক ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। শুরুর দিকে জামায়াতে ইসলামির তৎপরতা চিন্তাগত দিকেই সীমাবদ্ধ ছিল; মসজিদসমূহে হালকা বা মজলিশ অনুষ্ঠিত হতো, আঞ্চলিক ইউনিটগুলোতে কুরআনুল কারিমের দরস হতো। এই আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে যে, হাবিব বুরগিবা প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষতা তিউনিসিয়ায় ইসলামি পরিচয়-ভাবধারা ও আরবি চর্চার বিরুদ্ধে সংকট তৈরি করেছে। ইসলামি মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, শিক্ষাব্যবস্থার পদ্ধতি ও পন্থা এবং প্রচার-মাধ্যমের প্রণালি ও পরিকল্পনা হাবিব বুরগিবার প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী চিন্তাধারা থেকে ধারকৃত ও এর দ্বারা অনুপ্রাণিত। ফলে তিউনিসিয়ার ইসলামি আন্দোলন কেন্দ্রীয়ভাবে চিন্তা, আখলাক-শিষ্টাচার ও সাংস্কৃতিক দিকগুলোর ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। তারা এ-ব্যাপারে জোর দেয় যে, সার্বিক বিবেচনায় ইসলামি আদর্শই হলো সভ্য ও মার্জিত; পশ্চিমা সভ্যতা বস্তুগত দিক থেকে যতই উন্নতি সাধন করুক না কেন তা তিউনিসিয়া সমাজব্যবস্থার জন্য বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। পশ্চিমা সভ্যতায় বরং তিউনিসিয়ার অস্তিত্বকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হুমকি রয়েছে।

তিউনিসিয়ায় ক্ষমতাসীন দস্তুর পার্টি ১৯৮১ সালে রাজনৈতিক বহুত্ববাদের বৈধতার ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণার পরপরই জামায়াতে ইসলামির সদস্যরা একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তখন জামায়াতে ইসলামির প্রধান ছিলেন রাশিদ আল-গানুশি। এই সভার শেষে তাঁরা ঘোষণা করেন, তাঁরা জামায়াতে ইসলামি ভেঙে দিয়ে 'হারাকাহ আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামি' নামে একটি নতুন আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছেন। নতুন সংগঠনটির সভাপতি মনোনীত হন রাশিদ আল-গানুশি এবং সেক্রেটারি জেনারেল (মহাসচিব) মনোনীত হন আবদুল ফাত্তাহ মুরু। ১৯৮১ সালের ৬ই জুন আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠনটির উদ্বোধন হয় এবং এ-সভায় 'হারাকাহ আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামি'-এর মৌলিক গঠনতন্ত্রের বিবরণ দেওয়া হয়।

এই গঠনতন্ত্র নিম্নরূপ :

১. আদর্শিক ও নৈতিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

২. গোটা বিশ্বে মুসলমানদের সমস্যাবলির সঙ্গে সংগঠনটির সম্পৃক্ততা থাকবে।

৩. আরব জাতীয়তাবাদের বিষয়টিকে কোনো ধরনের স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।

৪. ফিলিস্তিন সমস্যাকে বিবেচনা করা হবে এইভাবে, তা সভ্যতার পথপরিবর্তনের ফল এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা অর্জিত হবে আরবদেরকে (ভিনদেশিদের) লুণ্ঠন ও ছিনতাই থেকে মুক্তি দেওয়ার মধ্য দিয়ে। সংগঠনটির অনেক শাখাসংস্থা থাকবে যারা জনমণ্ডলীর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাবে।

'হারাকাহ আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামি'-এর দুই নেতা রাশিদ আল-গানুশি ও আবদুল ফাত্তাহ মুরু সংবাদ সম্মেলন করেন। সংবাদ সম্মেলনের পরপরই সংগঠনটি সরকারি অনুমোদনের (লাইসেন্স) জন্য দাবি জানায়। কিন্তু সংগঠনটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনো জবাবই পায়নি। তাদের উত্থাপিত দাবিতে এ-আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যগুলো বর্ণিত ছিল। গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

১. ইবাদতের কেন্দ্র ও সাধারণ মুসলমানের সমাবেশস্থল হিসেবে মসজিদের জীবন ফিরিয়ে আনা।

২. চিন্তা-আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে উৎসাহিত ও বেগবান করা।

৩. আরবি ভাষাচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা দান এবং ভিনদেশি ভাষাগুলোর ক্ষেত্রে উন্মুক্ত নীতি গ্রহণ করা।

৪. পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে সহিংসতা প্রত্যাখ্যান করা।

৫. স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের নীতিকে প্রত্যাখ্যান করা। মতপ্রকাশ ও সমাবেশের স্বাধীনতাচর্চার ক্ষেত্রে সকলের অধিকারের স্বীকৃতিদান।

৬. আধুনিক রীতিনীতি ও পদ্ধতিতে ইসলামের সামাজিক তাৎপর্যকে স্ফটিকীকরণ (স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ করা)।

Contents

৭. ইসলামি চেতনাকে পাশ্চাত্যমুখী সাংস্কৃতিক বিপর্যয় থেকে মুক্ত করা।

সংগঠনটির আরও কিছু যৌক্তিক কার্যনীতি ছিল যা এই আন্দোলনকে চিন্তার বলয় থেকে বের করে রাজনীতির বলয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. ইসলামিক ডিসকোর্সের পরিপূর্ণতা ও পরিপক্বতা। তিউনিসিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবিকতায় অবদান রাখার প্রয়োজনে ইসলামি চিন্তাধারার কর্মীদেরকে সুযোগদান।

২. তিউনিসিয়ার কর্তৃত্বব্যবস্থার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত্ব করা এবং এর জন্য রাজনৈতিক পরিবর্তনে ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

৩. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও পাশ্চাত্যকরণের প্রবণতা ও শক্তিসমূহের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা।

৪. আরব ও ইসলামি বিশ্ব যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর মোকাবিলা করা। যেমন : আফগানিস্তান, লেবানন, ফিলিস্তিন ও অন্যান্য দেশের ঘটনাবলি।

এগুলোই ছিল আন্দোলনের দাবি এবং তাদের নৈতিক ভাবাদর্শ। ফলে রাষ্ট্রের এজেন্সিগুলোর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা-পর্যবেক্ষণ শুরু হয়। যার পরিণতি হলো ইসলামি আন্দোলনের ওপর দুর্দশা ও বিপর্যয়।

আশির দশকের বিপর্যয়

১৯৮১ সালের ১৮ই জুলাই থেকে দেশটির স্বৈরাচারী সরকার ইসলামি আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার করতে শুরু করে। সেপ্টেম্বর মাসে তাঁদের বিচারের মুখোমুখি করে ও আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। তাঁদের প্রতি অভিযোগ : লাইসেন্স বা সরকারি অনুমোদনবিহীন সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা; গণপ্রজাতন্ত্রী তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা; মিথ্যা সংবাদ ছড়ানো; সরকারবিরোধী প্রচারপত্র বিলি করা। তা সত্ত্বেও আবদুল ফাত্তাহ মুরু ১৯৮৩ সালে মুক্তি পান। তারপর রাশিদ আল-গানুশি মুক্তি পান ১৯৮৪ সালের আগস্টে। তিউনিসিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ মধ্যস্থতায় তাঁদের মুক্তি সম্ভব হয়েছিল।

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে 'আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামি' আন্দোলন একটি গোপনীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। রাশিদ আল-গানুশি ও আবদুল ফাত্তাহ মুরুকে সংগঠনটির প্রধান নেতা বহাল রাখার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

১৯৮৫ সালের জুন মাসে 'আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামি' আন্দোলন একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংগঠনটির চতুর্থ প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত এ-সম্মেলনে সকলের সামনে আগের গোপনীয় বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ করা হয়। রাজনৈতিক দপ্তরের সদস্যদের নামও প্রকাশ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাশিদ আল-গানুশি, আবদুল ফাত্তাহ মুরু ও সাদিক শুরু। এই তিনজন 'আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামি' আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বসমূহ পালন করতেন।

১৯৮৭ সালের আগস্টে রাশিদ আল-গানুশিকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তাঁরা ১৯৮৭ সালের আগস্ট মাসে রাজধানী তিউনিসে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় 'আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামি' আন্দোলনের সদস্যদের ব্যবহার করেন। রাশিদ আল-গানুশি এই অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং তিউনিসিয়া যে-সহিংসতার শিকার হয়েছে তার নিন্দা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু দেশটির নিরাপত্তা-আদালত রাষ্ট্রের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ফেলা ও ইরানের মতো বহিঃরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দেন। তাঁর সঙ্গীদের সাতজনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া হয়। সাতজনের মধ্য থেকে দুইজনের মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করা হয়।

১৯৮৮ সালের ১৫ই মে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নতুন প্রেসিডেন্ট যাইনুল আবেদিন বিন আলি রাশিদ আল-গানুশির প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করেন।

১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে সংগঠনটি তাদের নাম পাল্টে ফেলে; নতুন নামকরণ করা হয় 'হারাকাহ আন-নাহদা'। সংগঠন ও দল গঠনের জন্য সরকার যে-নীতিমালা প্রণয়ন করে তার সমর্থনেই নাম পরিবর্তন করা হয়। এই নীতিমালায় 'ধর্মীয় ভিত্তিতে দল গঠন' নিষিদ্ধ করা হয়। নাম পরিবর্তন

করার পর সরকারি অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা আগের মতোই এ-আবেদন প্রত্যাখ্যান করে।

১৯৮৯ সালের ২৮ শে মে আলজেরিয়ার উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করেন। আস-সাদিক শুরু 'হারাকাহ আন-নাহদা'র রাজনৈতিক দপ্তরের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাশিদ আল-গানুশি আলজেরিয়া থেকে সুদানে চলে যান। সুদানে তিনি শায়খ হাসান আত-তুরাবির আতিথেয়তায় অবস্থান করেন।

১৯৯১ সালে ও ১৯৯৮ সালে রাশেদ আল-গানুশির অনুপস্থিতিতে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত রায় প্রদান করেন। দুইবারই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দেওয়া হয়। রাশিদ আল-গানুশি বর্তমানে লন্ডনে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন।[৮৬] ২০০৭ সালে তিনি পুনরায় 'হারাকাহ আন-নাহদা'র সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন। এ-মনোনয়নের মধ্য দিয়ে তিনি এ-আন্দোলনের নেতা হিসেবে ২৫ বছর পূর্ণ করেছেন।

রাশিদ আল-গানুশি ব্রিটেনে অবস্থান করেও তিউনিসিয়ার ইসলামি আন্দোলনের অনুরণন বহন করে চলছিলেন এবং যাঁরা এই ইসলামি আদর্শকর্মের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছিলেন। বিভিন্ন আরব ও ইসলামি ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি কনফারেন্স ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। 'হারাকাহ আন-নাহদা'র (নেতৃবৃন্দের) নির্বাসনের ফলে তার রাজনৈতিক কার্যকারিতা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। বিবৃতি ও বক্তব্য প্রকাশের মধ্যেই তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এসব কাগুজে বিবৃতিই তিউনিসিয়ার ক্ষমতাবানদের ঘুম হারাম করে ছাড়ছিল। তারা বেশ কয়েকবার রাষ্ট্রীয়ভাবে বৃটেনের কর্তৃপক্ষের কাছে রাশিদ আল-গানুশির কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার প্রত্যুত্তরে জানিয়েছে যে, রাশিদ আল-গানুশি ব্রিটেনের বিদ্যমান আইনসমূহ লঙ্ঘন করেননি।

---

[৮৬] রাশিদ আল-গানুশি ২১ বছর নির্বাসিত জীবন কাটানোর পর ২০১১ সালের ৩০ শে জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন।

প্রগতিশীল ইসলামপন্থীরা

'আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামি' আন্দোলন প্রতিষ্ঠার চিন্তা রাজনৈতিক চরিত্রমণ্ডিত ছিল না। জামায়াতে ইসলামির প্রত্যেক উপাদানের সমাবেশ ঘটানোর মধ্য দিয়েই সংগঠনটির সূচনা হয়েছিল। 'আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামি' ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে গেলে সংগঠনটির দুটি অভিমুখ প্রকাশ পায় : একটি অভিমুখে ছিলেন রাশিদ আল-গানুশি ও আবদুল ফাত্তাহ মুরু। তাঁরা দুইজন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের (মুসলিম ব্রাদারহুডের) আদলে সংগঠন তৈরির উদ্দেশে আন্দোলন চালানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। অপর অভিমুখে[৮৭] গণ্যমান্য যাঁর পথ চলছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সালাহ উদ্দিন আল-জুরশি[৮৮], আহমিদা আন-নাইফার[৮৯] ও যিয়াদ কারিশান[৯০]। তাঁরা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের উদাহরণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁরা আন্দোলনকে তার চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক কর্মপরিমণ্ডলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এই দ্বিতীয় ভাবাদর্শের গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়েছে 'প্রগতিশীল ইসলামপন্থী' (التقدميون الإسلاميون) নামে পরিচিত সংগঠনটি।

নব্বই দশকের বিপর্যয়

যাইনুল আবেদিন বিন আলি তিউনিসিয়ায় রাষ্ট্রপরিচালনায় 'লৌহকঠিন মুঠি' নীতির ওপর নির্ভরশীল হলেন। যা-কিছু ইসলামি বা কোনো সূত্রে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত তার সবকিছুর বিরুদ্ধে উৎপীড়নমূলক স্বৈরাচারী

---

[৮৭] ইসলামি বামপন্থার অভিমুখে।

[৮৮] জন্ম : ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ। চিন্তাবিদ ও ইসলামি বামপন্থার তাত্ত্বিক। প্রখ্যাত সাংবাদিক ও মিডিয়াব্যক্তিত্ব।

[৮৯] জন্ম : ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ। ইসলামি বামপন্থী ও বাম তাত্ত্বিক। প্রগতিশীল ইসলামপন্থী হিসেবে পরিচিত।

[৯০] সাংবাদিক। দৈনিক আল-মাগরিব ও ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকীতে কাজ করেছেন। দর্শনে স্নাতক। ২০১২ সালের ২৩ শে জানুয়ারি তিনি একটি আদালতের সামনে হামলার শিকার হন। আদালতে তখন 'নাসমা' নামের একটি চ্যানেল সংক্রান্ত মামলার কার্যক্রম চলছিল। জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ তাঁকে গালাগালি করছিল। তারা বলছিল, হে দালাল, হে আল্লাহর শত্রু, ইত্যাদি।

কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার জন্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে কিনে নিলেন। স্বৈরাচারী বিন আলি যে-ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকা উড়িয়েছিলেন তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের; বরং তা ছিল তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মনিরপেক্ষতার চেয়ে উচ্চ মাত্রার। ৭ই নভেম্বরের বিপ্লব ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতিপর্বের কয়েক বছর পরেই বিন আলির ধর্মনিরপেক্ষতায় দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। তিনি দেশের একমাত্র ব্যক্তিরূপে পরিণত হয়েছিলেন। তিউনিসীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অরাজকতা ও স্বৈরাচারী উৎপীড়ন ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, চিন্তাগত কোনো ক্ষেত্রই বাকি ছিল না। ওই সময়টাতে কুরবানির ষাঁড় হয়েছিল কেবল ইসলামপন্থীরাই।

১৯৯১ সালে 'হারাকাহ আন-নাহদা' রাজনৈতিকভাবে ও মাঠ পর্যায়ে সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ ধারণ করেছিল। প্রত্যেক শহর, পল্লী ও গ্রামের মহল্লাগুলোতে, ইউনিয়ন ও সংস্থাগুলোতে এ-আন্দোলনের শক্তিশালী উপস্থিতি ছিল। শত্রু ও বন্ধু সবাই এ-আন্দোলনকে সম্মান জানাত।[৯১] দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের দিনগুলোতে (১৯৯১-১৯৯২) স্বৈরাচারী শাসক ও 'হারাকাহ আন-নাহদা'র মধ্যে মুখোমুখি লড়াইয়ের আগুন জ্বলে উঠেছিল। তা একটি দুর্লভ সুযোগ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। বিরোধী দল ও শহুরে সমাজের প্রতি শাসক গোষ্ঠীর আচরণপদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দেশটির নতুন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের খুব সহজেই অন্যদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা তুলে দেওয়ার অভিপ্রায় ছিল না।[৯২]

তিউনিসিয়ার ইতিহাসে ইসলামি আন্দোলনের বিরুদ্ধে নব্বইয়ের দশকের সময়টা ছিল সবচেয়ে বিভীষিকাময়। এই দুর্যোগের ফলাফল ছিল এরূপ : যে-কেউ—'বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও কালপর্বে মুসলিম উম্মাহর সমস্যা ও সংকটের সমাধান একমাত্র ইসলাম'—এই স্লোগান উচ্চকিত করেছে সে-

---

[৯১] مستقبل الاسلام السياسي في تونس, আলি বিন সাঈদ, আকলাম, রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক সাময়িকী, সংখ্যা ১৮, ৫ম বর্ষ, জুলাই, ২০০৬।

[৯২] مفارقة تونسية.. نمو اقتصادي يُقابله تصلب سياسي, সালাহ উদ্দিন আল-জুরশি, ২০০৭ সালের ১৩ই অক্টোবর প্রকাশিত প্রবন্ধ, http://www.swissinfo.ch.

ই নির্বাসনের শিকার হয়েছে। পার্লামেন্টারি নির্বাচন, ট্রেড ইউনিয়ন নির্বাচন, ছাত্র সংসদ ও স্থানীয় নির্বাচনে ইসলামি আন্দোলনের প্রতি তিউনিসীয় জনমণ্ডলীর সীমাহীন ভালোবাসা ও অনুরাগের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ দেখে স্বৈরাচারী শক্তি উন্মাদ হয়ে ওঠে। তারা তিউনিসিয়ায় ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য নির্মূলীকরণ, জুলুম, নির্যাতন-উৎপীড়ন ইত্যাদিকেই অস্ত্র হিসেবে বেছে নেয়। স্বৈরাচারী গোষ্ঠী বুঝতে পারে যে, রাজনৈতিক জীবনে ব্যাপ্তিশীল ইসলামই দেশে একমাত্র প্রধান শক্তি যা তাদের ক্ষমতার মসনদ উল্টিয়ে দিতে পারে। আন-নাহদার সঙ্গে রক্তক্ষয়ী মুখোমুখি সংঘাতে স্বৈরাচারী সরকার দিশেহারা হয়ে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর মধ্যে গুটিয়ে যায়; নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ইসলামপন্থীদের ও সমাজে সকল দৃশ্যমান ধর্মীয় কার্যাবলির বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে।

১৯৯১ সালের মে মাসে স্বৈরাচারী শাসক নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীদের গ্রেপ্তার করার অনুমতি দেয়। তখন ইসলামি আন্দোলনের কর্মীসংখ্যা ছিল ৮ হাজার। ১৯৯২ সালের আগস্টে সামরিক আদালত আন্দোলনের ২৫৬ জন নেতা-কর্মীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন দণ্ডাদেশ দেন। তা ছাড়া সাত হাজারেরও বেশি কর্মী দেশ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভিনদেশে আশ্রয় নেন। তাঁরা গণগ্রেপ্তার ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো নিরবচ্ছিন্ন হয়রানি ও হেনস্থার এক কারাগার থেকে পালিয়ে যান। নব্বইয়ের দশকের দুর্যোগ-দুর্দশার পরপরই আন-নাহদা বড় ধরনের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে। যে-সময়টাতে প্রতিদিনই ভয়ংকর বিক্ষোভ ও অবরোধের মুখে তিউনিসিয়ার দৈনন্দিন জীবন, পুলিশ ব্যবস্থা, কারাগার ব্যবস্থা এমন অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলো ভেঙে পড়ে সেই সময় আন-নাহদার বৈশ্বিক নেতৃত্বেও পরিবর্তন আসে।[৯৩]

নব্বইয়ের দশকটা ছিল শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে 'হারাকাহ আন-নাহদা'র সম্পর্কের ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ সময়। কারণ, এই আন্দোলনকে টুকরো টুকরো করে অকেজো করে দেওয়ার যত সম্ভাবনা রাষ্ট্রযন্ত্রের ছিল তার সবগুলোই তারা কাজে লাগিয়েছিল। আন্দোলনের কার্যক্রম ও তৎপরতার

---

[৯৩] مستقبل الاسلام السياسي في تونس, আলি বিন সাঈদ, আকলাম, রাজনৈতিক বুদ্ধিবৃত্তিক সাময়িকী, সংখ্যা ১৮, ৫ম বর্ষ, জুলাই, ২০০৬।

বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সংকট ও ঝুঁকি সৃষ্টি করেছিল। বরং আন-নাহদার কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কগুলোকে ছিন্ন করে দিয়েছিল। এই কালপর্বে আন-নাহদা যে-দুর্দশা ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে, দেশটিতে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনোও রাজনৈতিক ও মতবাদপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। রাষ্ট্রযন্ত্র যেন ভুলেই গিয়েছিল যে, 'হারাকাহ আন-নাহদা'র ইসলামপন্থীরা তিউনিসিয়ার নাগরিক। নব্বইয়ের দশকের বছরগুলো কেবল ইসলামপন্থীদের জন্যই বিভীষিকাপূর্ণ ছিল না; বরং গোটা তিউনিসীয় সমাজের ওপর বিরাট পাহাড়ের মতো চেপে বসেছিল।[৯৪] আজ পর্যন্ত তিউনিসিয়ার শাসকদের পক্ষ থেকে রাশিদ আল-গানুশির নেতৃত্বাধীন 'হারাকাহ আন-নাহদা'র স্বীকৃতি মেলেনি।

তিউনিসিয়া থেকে বিন আলির পালিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত ইসলামি আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের অধিকার-বঞ্চনা অব্যাহত থাকে। অধিকার-বঞ্চনার নিকৃষ্ট দৃশ্যমান উদাহরণ এই যে, চৌদ্দ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই আন্দোলনের শত শত নেতা ও হাজার হাজার সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের সঙ্গে কঠোর আচরণ ও নির্যাতন করা হয়। এই আন্দোলনের শত শত কর্মীকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তাঁদের অনেকে বিশ বছরেরও বেশি সময় নির্বাসনে কাটান। উদাহরণ আরও আছে। জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হাজার হাজার কর্মীর বিরুদ্ধে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করা হয়। কর্মক্ষেত্রে তাদের নিষিদ্ধ করা হয়। বছরের পর বছর ধরে তাদের ওপর প্রশাসনিক নজরদারি অব্যাহত রাখা হয়। ইসলামি ভাবধারায় পরিচালিত বা ইসলামি চিন্তাধারার সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক রয়েছে এমন কোনো রাজনৈতিক সংগঠন বা বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্থাকে আইনগতভাবে বৈধ কর্মকাণ্ডেও জড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। অথচ অনেক বামপন্থী ও

---

[৯৪] الإسلاميون والسلطة في تونس.. قراءة في مسار الحياة السياسية وأفق تطويرها بتاريخ, আল-আজমি আল-ওয়ারিমি, http://www.alhiwar.net, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯।

জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলকে তাদের কার্যক্রম ও তৎপরতা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়।[৯৫]

১৯৯১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি আন-নাহদার (দেশের অভ্যন্তরীণ অংশের) সভাপতি হিসেবে আস-সাদিক শুরুকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনের পর বেশ কয়েকবার অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়। ১৯৯২ সালে আন-নাহদা আন্দোলনের প্রধান নেতার বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে রায় ঘোষণা করা হয়। পাবলিক প্রসিকিউশন (সরকার-পক্ষীয় বাদী) তাঁর ফাঁসি দাবি করে। কিন্তু মানবাধিকার সংগঠনগুলোর চাপের মুখে সরকার তাঁর বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়। এরপর তাঁকে এক জেল থেকে আরেক জেলে ঘোরানো হয় এবং তাঁর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়, যাতে তিনি এই আন্দোলনের নিন্দা করেন এবং রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চান। কিন্তু তিনি নতি স্বীকার করেননি। সামরিক আদালতের সমানে তাঁর যে-বক্তব্য ভাস্বর হয়ে আছে তা এই : হে বিচারপতিরা, তোমরা যদি তোমাদের কার্যকলাপ দ্বারা আন-নাহদার আন্দোলনকে তার সমাজ ও যে-মাটিতে তা রোপিত তা থেকে উৎপাটন করতে চাও তাহলে মনে রেখো, তা এমন বৃক্ষ যার শেকড় গভীর মাটিতে প্রোথিত এবং যার শিখর আকাশ ছুঁয়েছে।[৯৬]

---

[৯৫] الأولوية الرئيسية في تونس إطلاق سراح المساجين الإسلاميين, মুহাম্মদ আল-হাশিমি আল-হামিদি, http://www.alwohdah.com/, ২৬ শে এপ্রিল, ২০১০।

[৯৬] ইসলামপন্থীদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আস-সাদিক শুরুর সঙ্গে আলোচনা।

Contents

অরাজকতার মুখে জাগরণ

কত পবিত্র মহান আল্লাহ, যাঁর হাতে সমস্ত আকাশ ও জমিনের কর্তৃত্ব! ২০০২ সালে তিউনিসিয়ায় ইসলামি জাগরণের স্ফূরণ ঘটে। তা ছিল সম্ভবত ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলির পর আমেরিকার নেতৃত্বে ইসলামের বিরুদ্ধে নির্লজ্জ লড়াইয়ের প্রতিক্রিয়া। অধিকাংশ সময় আমরা যা দেখেছি তা এই যে, মাত্রাতিরিক্ত জুলুম-নির্যাতন মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের শক্তির বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে নতুন করে হিজাব ও পর্দা ছড়িয়ে পড়ে। তিউনিসিয়ার সরকারের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জুলুম-জবরদস্তিমূলক আইন, স্বৈরাচারী শাসনের লৌহদণ্ড, জেল, কারাগার, গ্রেপ্তার, হেনস্থা, নির্যাতন...এমন যা-কিছু আছে তিউনিসিয়ার নারী-পুরুষদের হৃদয় ইসলামের ভালোবাসা মুখে ফেলতে পারেনি। ইসলাম হলো মুমিনদের হৃদয়ে জ্বলন্ত অগ্নিশিখা; কদাচিৎ তা দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু কখনো তা নেভে না।

এই সময়টায় ইন্টারনেটে কয়েকটি ইসলামিক সাইট তৈরি করা হয়। কয়েকটি ইসলামিক স্যাটেলাইট চ্যানেলেরও প্রকাশ ঘটে। ইসলামি বিশ্বের সব জায়গায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামি জাগরণের তরঙ্গ ওঠে। এই জাগরণের ঝড়ো বাতাস তিউনিসিয়ার উপর দিয়ে বয়ে যায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হিজাব প্রবেশ করতে শুরু করে। একইভাবে সরকারি ও বেসরকারি অফিসগুলোতেও হিজাবের প্রবেশ ঘটে।

এই গভীর চৈতন্য-স্ফূরণের সামনে তিউনিসিয়ার সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। হিজাব পরিধানকারীদের, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জবরদস্তি ও হেনস্থা করতে শুরু করে। সরকার তিউনিসিয়ার সংবিধান-পরিপন্থী ও উৎপীড়নমূলক আইন প্রয়োগের আশ্রয় নেয়।

কিন্তু ঈমানের প্রেরণা তিউনিসিয়ার নিষ্কলুষ জাতির রগ-শিরায় কার্যকরীভাবেই প্রবাহিত হয়েছিল। ইসলামের অস্তিত্ব ও দৃঢ়তার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন সরকারের অন্যায়-জুলুম-বাড়াবাড়ি সকলের কাছেই প্রত্যাখ্যাত

Contents

হয়েছিল। এর ফলে ২০০২ সালে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে জনমণ্ডলীর বিভিন্ন অংশের শক্তিশালী প্রতিরোধ-বিক্ষোভে তিউনিসিয়ার বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। এই বিক্ষোভের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ছিল এই যে, তিউনিসিয়ার কয়েকজন আইনজীবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রপতির কাছে নিষ্কলুষ পবিত্র তিউনিসীয় নারীদের ও ইসলামি পোশাক পরিধানকারীদের ইজ্জত-সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত করার প্রহসন বন্ধের দাবি জানান। ২০০৩ সালের ৩০ শে মে দেশটির জাতীয় পরিষদের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এই বিবৃতিতে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যে হিজাব পরিহিতা ছাত্রীদের শিক্ষালয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

তিউনিসিয়ায় হিজাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কয়েকটি চিত্র

এই ইসলামি জাগরণের পাশাপাশি বিপরীত দিকে তিউনিসিয়ার কয়েকটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী সংগঠনগুলোও নড়েচড়ে ওঠে। এসব সংগঠনের পত্র-পত্রিকায় তীব্র বাদানুবাদ চলতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নারীদের সংগঠন তিউনিসিয়ান এসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক ওইমেন[৯৭] তাদের ২০০৪ সালের ৮ই মার্চের[৯৮] বার্ষিক সম্মেলনে চূড়ান্তভাবে হিজাব বর্জন করে। তাদের ভাষায়, হিজাব নারীদের বন্দি করে রাখে এবং পশ্চাৎপদতায় আটকে রাখে।

নারীদের হেনস্থা ও সম্ভ্রম-লুণ্ঠনের ঘটনা থামে না। মাঝে মাঝে এটি বাল্যসুলভ কর্মকাণ্ডে রূপ নেয়, যা সুস্থ মানুষের মস্তিষ্ক কবুল করে না। তিউনিসিয়ার পুলিশ সদস্যরা শিশুদের খেলনার দোকানগুলোতে আকস্মিক হানা দেয় এবং যেসব দোকান 'ফুল্লা' খেলনা বিক্রি করে তাদের হুমকি-ধমকি দেয়। ফুল্লা হলো হিজাব পরিহিতা বালিকা (খেলনা)। অর্থাৎ, এমনকি শিশুদের খেলনাগুলোরও হিজাব পরার অনুমতি নেই! পরিস্থিতি যখন এই পর্যায়ে তখন এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শিশুদের কারিকুলাম

---

[৯৭] Tunisian Association of Democratic Women : গণতান্ত্রিক নারীসংঘ, তিউনিসিয়া।

[৯৮] বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে।

বা পাঠ্যপুস্তকগুলো হিজাব পরিহিতা মেয়ে ব. নারীর ছবি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল। বরং ২০০৬ সালে শিক্ষামন্ত্রী সাঈদা আদালাহ নামের একজন শিক্ষিকার বিরুদ্ধে একটি আদেশ জারি করেন; এই আদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে হিজাব পরিধানের অপরাধে সাঈদার ৩ মাসের জন্য বেতন কর্তনসহ পাঠদান নিষিদ্ধ করা হয়। তবে আলহামদুলিল্লাহ—তিউনিসিয়ার আদালত শিক্ষামন্ত্রীর এই সংবিধান-পরিপন্থী সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেন।

২০০৮ সালে নারী ও পরিবার মন্ত্রণালয়[৯৯] একটি ফরমান জারি করে। এই ফরমানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করা হয়। এই ফরমানে দেখানো হয় যে, হিজাব বা যা-কিছুর দ্বারা মাথা ঢেকে রাখা যায়, যেমন : রুমাল বা ক্যাপ—তা উগ্রপন্থারই একটি রূপ। শুধু তা-ই নয়, এই ফরমানে যে-কেউ হিজাব পরিধান করে বা হিজাবের অনুরূপ বস্তু ব্যবহার করে তাদের বাধা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। যেন হিজাব বা রুমাল একটি সন্ত্রাসবাদী অস্ত্র; যেসব নারী এই অস্ত্র বহন করে তাদের বাধা প্রদান করতেই হবে!

২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিউনিসিয়ার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে হিজাব পরিধান করবে না মর্মে মুচলেকা প্রদানে বাধ্য করে।

এসব ঘটনা কেবল হিজাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অংশ নয়; বরং খোদ ইসলামেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধের অংশ।

হিজাব ও পর্দার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যেসব চিত্র আমরা বর্ণনা করলাম তা তিউনিসীয় সরকারের যা-কিছু ইসলামি তার বিরুদ্ধে কঠোরতা ও উৎপীড়নের একটি দিকের চিত্রমাত্র। অন্যথায়, সব ক্ষেত্রে সবদিকেই এমন চিত্র রয়েছে। সব ক্ষেত্রে দুঃখ ও যন্ত্রণা গভীর। মানবাধিকার সংস্থাগুলো নিরবচ্ছিন্ন অন্যায়-অত্যাচার-জুলুমের খতিয়ান তৈরি করে যাচ্ছিল। এসবের চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার হলো তিউনিসিয়ার স্বৈরাচারী সরকারের 'ঝরনা বিশুষ্ককরণ' প্রকল্প বাস্তবায়ন। অনলাইনে তৈরি-করা

---

[৯৯] The Ministry of Women and Family Affairs.

সংরক্ষণশীল ইসলামি সাইটগুলোর ওপর প্রযুক্তিগত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কয়েকটি স্যাটেলাইট চ্যানেলের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। একইভাবে উলামা-মাশায়েখদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ করা হয়। মোটকথা, সরকার তিউনিসীয় জনমণ্ডলীকে ইসলামি দেশগুলোতে চলমান ইসলামি জাগরণের স্ফূরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

তা ছাড়াও যাইনুল আবেদিন বিন আলির সরকার ইবাদত-বন্দেগির উপকরণের ওপরও সংকট তৈরির চেষ্টা করেছে। তাদের এহেন চেষ্টার প্রথম শিকার হলো নামাজ।

তিউনিসিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাদি মিহান্না ঘোষণা করেন, 'ম্যাগনেটিক (তড়িৎ-চুম্বকীয়) প্রবেশপত্র' ছাড়া নামাজ পড়া বৈধ নয়। প্রত্যেক মুসল্লির এ-ধরনের প্রবেশপত্র থাকতে হবে। যাতে মসজিদগুলোতে শৃঙ্খলা ও নিয়মের সঙ্গে নামাজ-ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়। তিনি আরও ঘোষণা করেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যারা তাদের মহল্লার নিকটতম মসজিদে যাওয়ার জন্য বা প্রয়োজন হলে অফিসে নামাজ পড়ার জন্য প্রবেশপত্র চাইবে কেবল তাদেরকেই এ-ধরনের প্রবেশপত্র দেওয়া হবে। তাদের জন্য অনুমোদিত মসজিদটি ব্যতীত অন্যকোনো মসজিদে নামাজ পড়ার অনুমতি কিছুতেই দেওয়া হবে না।

একইভাবে মুসল্লিদের জন্য আবশ্যক করে দেওয়া হয় যে তাদেরকে বিশেষ প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে, যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা থাকবে যে তারা জুমার নামাজে আগ্রহী! মসজিদের ভেতরে ও চত্বরে উপস্থিত মুসল্লিবৃন্দের প্রবেশপত্র আছে কি-না তা যাচাই করার জন্য ইমাম সাহেবদের কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দেওয়া হয়। একইভাবে প্রত্যেক মসজিদের ইমামের জন্য এ-আইন বিধিবদ্ধ করা হয় যে, তিনি প্রবেশপত্রহীন মুসল্লিকে এবং অন্য মসজিদের জন্য—যেখানে সে নামাজ পড়ছে না—ইস্যুকৃত প্রবেশপত্রধারী মুসল্লিকে তাড়িয়ে দেবেন।

অরাজকতা ও ভাঙন

যাইনুল আবেদিন বিন আলির সরকার জাতির সঙ্গে প্রহসনমূলক আচার-আচরণের যে-বিরল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাতে দেশজুড়ে নানা সমস্যা ও সংকট তৈরি হয়। এই সংকটের গুরুত্বপূর্ণ দিক সমাজের সর্বস্তরে অরাজকতা ও ভাঙন ছড়িয়ে পড়া। এগুলো ছিল নারীদের নগ্ন ও উন্মোচিত করার ফলাফল। তিউনিসিয়ার ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ফ্যামিলি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (জাতীয় পরিবার ও মানব উন্নয়ন অধিদপ্তর) তাদের একটি গবেষণায় দেখায় যে, ১১.৯% তিউনিসীয় তরুণী বিবাহপূর্ব যৌনসম্পর্ক সমর্থন করে; একইভাবে তিউনিসিয়ার ৪০% তরুণ বিবাহপূর্ব যৌনসম্পর্কে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করে না। তরুণ-তরুণীদের এই হার চূড়ান্ত পর্যায়ের আশঙ্কাজনক ও ভীতিকর। তাদের গবেষণায় এই ক্ষেত্রে এটা সর্বনিম্ন হার। কিন্তু আরও কিছু গবেষণা হয়েছে যেখানে এই হার আরও বেশি দেখানো হয়েছে।

সরকারি সংস্থা ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্‌থ সার্ভে ২০০৭ সালে তিউনিসিয়ার পরিবারগুলোর ওপর পরিচালিত একটি জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে। এই জরিপে দেখা যায় যে, ১৮% বিবাহিত নারী ও ৬০% বিবাহিত পুরুষ (যাদের বয়সের স্তর ১৮ থেকে ২৯ বছর) শরিয়তবিরোধী বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে আছে! নিশ্চয় এটি বড় ধরনের দুর্যোগ।

এই পর্যায়ের অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্মকাণ্ডের প্রসারের ফলে অবিবাহিত থাকার হার অতিরিক্ত মাত্রায় বেড়ে যায়। যে-সকল যুবকের বয়স ২৫ থেকে ২৯ বছর তাদের মধ্যে ২০০৬ সালে অবিবাহিতের হার ছিল ৬৫%, অথচ ২০০১ সালে এই হার ছিল ৫৩.৯%।

স্বৈরাচারী শাসনের সমাপ্তি

সেসব ছিল যন্ত্রণা-দুর্দশার কালো অধ্যায়। তিউনিসীয় মুসলিম জাতিকে সময়ের সেই অধ্যায়গুলো যাপন করতে হয়েছে। তাদেরকে ইসলামের পরিচয় ও আরবি ভাবধারা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জুলুম, অরাজকতা, নিপীড়ন, জবরদস্তি, নির্যাতন, গ্রেপ্তার, কারাগার, নির্বাসন, বিতাড়ন, নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর হয়রানি-হেনস্তা, লৌহমুঠির বজ্র আঁটুনি সেসব অধ্যায়ে প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল।

Contents

এই স্বৈরাচারী শাসক তেইশ বছর জুলুম-নির্যাতন-নিপীড়ন-লৌহদণ্ডের দ্বারা দেশ শাসন করেছিল। সে টেরও পায়নি যে, ঔদ্ধত্য ও সীমালঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে তার ধ্বংস ও পতনই ত্বরান্বিত হচ্ছে। জাতীয় মহাঅভ্যুত্থানের পরপরই স্বৈরাচারী শাসকের কার্যকরী পতন ঘটে। ২০১১ সালের ১৪ই জানুয়ারি জুমার দিন সে লেজ টানতে টানতে পালিয়ে যায়। তার প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও মুনাফিকি তার কোনো উপকার করেনি। কারণ, তিউনিসীয় জাতি এতটা মেধাবী যে তাদেরকে ধোঁকা দেওয়া যায় না।

এই অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের কাহিনি কী? কীভাবে এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে?

বিপ্লবের পটভূমি

আমরা যদি ২০১০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পেছনের দশ বছর অর্থাৎ, তিউনিসীয় বিপ্লবের পূর্বের সময়টাতে দেশটির ঘটনাপারম্পর্যের দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখব যে, তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পর থেকে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময়ে মাত্র দুইজন রাষ্ট্রপতি দেশটি শাসন করেছেন। এই সময়ে দেশটির সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনে বেশ কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে, সংযোজন-বিয়োজন ঘটেছে। তা সত্ত্বেও, আমরা আস্থার সঙ্গেই বলতে পারি, এই দীর্ঘ কালপর্বে যা ঘটেছে তা হলো রীতিনীতির আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন কেবল, তিউনিসিয়ার রাজনীতির চরিত্র সংশোধনে তা কোনো গভীর ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করেনি। বিপরীত দিকে বরং সংবিধান-সংশোধনী ও আইন-কানুনের পরিবর্তন রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে তুলে দিয়ে কুক্ষিগত করে রাখতে সহায়তা করেছে। এসব লোক প্রেসিডেন্ট বিন আলির নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় সুবিধা ভোগ করেছে।

তিউনিসিয়ার সংবিধান অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সংবিধানের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। সব সংবিধানই রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বকে অনুমোদন দিয়েছে। তিউনিসিয়াতেও প্রকৃত বহুত্ববাদের অস্তিত্বকে জানান দেওয়ার জন্য কিছু দল ছিল। অথবা রাষ্ট্রের ক্ষমতা চর্চায় ও কার্যকরী ভূমিকা পালনে সেসব দলের প্রকৃত অর্থেই অংশীদারিত্ব ছিল। উদাহরণত, এসব দলের মধ্যে রয়েছে :

১. ডেমোক্রেটিক কনস্টিটিউশনাল র‍্যালি (Democratic Constitutional Rally)।[১০০] এটি প্রেসিডেন্ট যাইনুল আবেদিন বিন আলির দল। প্রতিষ্ঠাকাল : ২৭ শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ।

২. মুভমেন্ট অফ সোশ্যালিস্ট ডেমোক্রেট্স্ (Movement of Socialist Democrats)।[১০১] প্রতিষ্ঠাকাল : ১০ই জুন, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ।

৩. ইউনিয়নিস্ট ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন (Unionist Democratic Union)।[১০২] প্রতিষ্ঠাকাল : ৩০ শে নভেম্বর, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ।

৪. পপুলার ইউনিটি পার্টি (Popular Unity Party)।[১০৩] প্রতিষ্ঠাকাল : জানুয়ারি, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ।

৫. আত-তাজদীদ মুভমেন্ট (Ettajdid Movement)।[১০৪] প্রতিষ্ঠাকাল : ২৩ শে এপ্রিল, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ।

৬. সোশ্যাল লিবারেল পার্টি (Social Liberal Party)।[১০৫] প্রতিষ্ঠাকাল : ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ।

৭. গ্রিন পার্টি।[১০৬] প্রতিষ্ঠাকাল : ১৪ই নভেম্বর, ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৮. প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটি পার্টি (Progressive Democratic Party)।[১০৭] প্রতিষ্ঠাকাল : ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।

---

١٥٠ التجمع الدستوري الديمقراطي

١٥١ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين

١٥٢ الاتحاد الديمقراطي الوحدوي

١٥٣ حزب الوحدة الشعبية تونس

١٥٤ حركة التجديد

١٥٥ الحزب الاجتماعي التحرري

١٥٦ حزب الخضر

١٥٧ الحزب الديمقراطي التقدمي

৯. ডেমোক্রেটিক ফোরাম ফর লেবার অ্যান্ড লিবার্টিস (Democratic Forum for Labour and Liberties)।[১০৮] প্রতিষ্ঠাকাল : ৯ই এপ্রিল, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।[১০৯]

রাজনৈতিক বহুত্ববাদের এই যে উচ্ছ্বাস, এটা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবের বিপরীত। তিউনিসিয়ার রাজনৈতিক মানচিত্র একটিমাত্র দলের ক্ষমতার পদভারে ন্যুব্জ ছিল। তা হলো যাইনুল আবেদিন বিন আলির নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক কনস্টিটিউশনাল র‍্যালি। পার্লামেন্টে ওইসব দলের ভিড়ভাট্টা এ-অবস্থারই প্রতিচ্ছবি। পার্লামেন্টে ক্ষমতাসীন দলেরই দাপট ছিল। বিন আলির রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হওয়ার পর থেকে এ-দলটি অন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ওপর বছরের পর বছর ধরে কর্তৃত্ব করেছে। স্বাভাবিকভাবেই এই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে যাইনুল আবেদিন বিন আলি সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করেছেন। এ-রঙ্গমঞ্চের ঘটনাচক্র কোনো প্রস্তরযুগে ঘটেনি; বরং একবিংশ শতাব্দীতেই ঘটেছে। এই ঘৃণ্য পরিস্থিতিই বিন আলিকে ২০০২ সালে কয়েকটি সাংবিধানিক সংশোধনী আনার সুযোগ করে দেয়। এসব সংশোধনীতে একজন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে মাত্র তিনবার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলে যে-আইন ছিল তা বাতিল করা হয়। প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থিতার উপযোগী বয়স ছিল অনূর্ধ্ব ৭০ বছর। তা বাড়িয়ে প্রেসিডেন্ট-প্রার্থিতার বয়স ৭৫ বছর করা হয়। ফলে বিন আলি ২০০৪ সালে চতুর্থবারের মতো প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পান।[১১০]

বিদ্যমান পরিবেশ-পরিস্থিতির ফলেই ২০০৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক কনস্টিটিউশনাল র‍্যালি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। তারা পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। ১৮৯ টি আসনের মধ্যে ১৫২ টি আসনই তাদের দখলে যায়। বাকি আসনগুলো

---

[১০৮] التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات

[১০৯] الأحزاب التونسية .. تعددية مختزلة بنظام الحزب الواحد, সাহার নাসের, ১৮ই জানুয়ারি, ২০১১।

[১১০] الحياة السياسية فى تونس .. قرائة أولية, কামাল আল-কাসির, مركز الجزيرة للدراسات, ১৫ই জানুয়ারি, ২০০৯।

অন্যান্য দলের মধ্যে বিভিন্ন হারে বণ্টিত হয়। ৯৪.৪৮% ভোটের দ্বারা প্রেসিডেন্ট বিন আলির বিদ্যমান কর্তৃত্ব বহাল রাখার মধ্য দিয়ে এই রঙ্গনাট্যের সমাপ্তি ঘটে। বিন আলি চতুর্থবারের মতো দেশটির প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন।[১১১]

বিন আলি তাঁর আগের পথেই চলতে থাকেন এবং পূর্বের শাসনপদ্ধতিই বহাল রাখেন। তিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রাখেন। মুখগুলোকে বোবা করে দেন। যেকোনো বিরোধী তৎপরতা, বিশেষ করে ইসলামপন্থীদের তৎপরতা কঠোর হাতে দমন করেন। কারণ, তাঁরা তাঁকে নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধি ও রাষ্ট্রের সংশোধনের প্রতি আহ্বান জানাত!

তিউনিসিয়ার পরিবেশ-পরিস্থিতি অধিকতর প্রহেলিকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল। সরকার কর্তৃক যেকোনো বিরোধী শক্তিকে দমন করার ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল দমবন্ধ অবস্থায়। অন্যদিকে দ্বীনি-ইসলামি স্রোতধারা ও আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ, প্রকাশ্য কার্মকাণ্ড (বিশেষ করে হিজাব ও পর্দা) বেড়ে চলছিল। যদিও সরকার ইসলামপন্থীদের তৎপরতা কঠোর হাতে দমন করছিল এবং সংশ্লিষ্ট নেতাদের কারাগারে পুরে রেখেছিল। এসব বিষয় শাসকদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছিল। তিউনিসিয়ায় তখন ইসলামি ভাবধারা কেবল কোনো দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, গোটা জাতির মধ্যে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে সরকারের নিরবচ্ছিন্ন দমন-পীড়নমূলক নীতি সত্ত্বেও তা শাসকদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছিল।

এসব কারণেই হয়তো ২০০৮ সালে আন-নাহদা ইসলামি আন্দোলনের সপ্তবিংশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ দেশে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। রাশিদ আল-গানুশির ভাষায়, শাসকদের পুরোনো কৌশলেই অব্যাহতভাবে গোঁ

---

[১১১] الحياة السياسية فى تونس .. قراءة أولية, কামাল আল-কাসির, مركز الجزيرة للدراسات, ১৫ই জানুয়ারি, ২০০৯।

ধরে থাকা এবং কোনো ধরনের পরিবর্তন না-আনার ফলে দেশ একটি দীর্ঘস্থায়ী অরাজক ও সহিংস পরিস্থিতিতে প্রবেশ করবে।[১১২]

আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, জনসম্পৃক্ত মধ্যপন্থী ইসলামি ভাবধারা নেতৃবৃন্দের দিকনির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন তিউনিসিয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরি। কারণ, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা ও দমন-পীড়নমূলক নীতির ফলে যে-ধর্মীয় উগ্রবাদ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে তার লাগাম টেনে ধরতে হবে। তা ছাড়া জাতির এ-ধর্মীয় চেতনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার মতো কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দও নেই। তারপরও সরকারের অবস্থান পূর্ববৎ বহাল থাকে। ইসলামের নিদর্শনাবলি, বিশেষ করে পর্দা ও হিজাবের বিরুদ্ধে সরকারি দলের যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সরকারি ও প্রাইভেট সংস্থাসমূহ থেকে হিজাব ও পর্দা নির্মূলীকরণে ক্ষমতাসীনদের একগুঁয়েমি অব্যাহত থাকে। একইভাবে রাস্তা-ঘাট থেকে, এমনকি ঘরের অভ্যন্তর থেকেও পর্দা ও হিজাব দূর করার চেষ্টা চলমান থাকে। এই উদ্দেশ্যে বাড়িঘরে হানা দেওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হিজাব পরিধানকারী ছাত্রীদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা—কোনোটাই বাদ যায়নি।

ওই সময়টাতে আন-নাহদা আন্দোলনের প্রধান ড. আস-সাদিক শুরুর বন্দিত্বকাল প্রলম্বিত হচ্ছিল। কারাগারে তাঁর প্রায় দুই যুগ পেরিয়ে গিয়েছিল। এমনকি তিনি তিউনিসিয়ার নেলসন মেন্ডেলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। প্রথম দুই বছর বাদ দিলে এ-কালপর্ব ছিল পরিবর্তনের শ্লোগানধারী শাসনকাল, যা প্রেসিডেন্ট বিন আলিকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিল। প্রেসিডেন্ট হাবিব বুরগিবার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের পর নতুন শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা ও তার বৈধতা নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে এ-কালপর্বের প্রথম দিকটা কেটে গিয়েছিল।

ড. আস-সাদিক শুরুকে মুক্তিদানের ব্যাপারে বিভিন্ন দিক থেকে যে-সকল আহ্বান ও আবেদন আসছিল, বিন আলি তা না-শোনার ভান করছিলেন। ইসলামি বিশ্বের প্রখ্যাত আলেমগণের সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন

---

[১১২] تونس بعد ٢٧ سنة "نهضة" و٢١ سنة "بن علي" , মুহাম্মদ জামাল আরাফাহ, আল-ফজর নিউজ, ২৯ শে জুন, ২০০৮, www.turess.com.

অফ মুসলিম স্কলার্স (International Union of Muslim Scholars)[১১৩]-এর প্রধান ড. ইউসুফ আল-কারযাবী ও এ-সংস্থার বোর্ড অফ ট্রাস্টির সদস্য শায়খ ফয়সাল মাওলাবির নেতৃত্বাধীন একদল বড় বড় আলেম আস-সাদিক শুরুকে মুক্তিদানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিন আলি এতে কান দেননি।[১১৪]

তিউনিসিয়ার ভূমিতে আন-নাহদা আন্দোলনের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির ফলে বিভিন্ন ধরনের ছড়ানো-ছিটানো ইসলামি শক্তির উদ্ভব ঘটে। তারা কারও নেতৃত্বাধীন ছিল না; এবং এসব শক্তির শৃঙ্খলিত আন্দোলনও ছিল না। তিউনিসিয়ায় আন-নাহদার সক্রিয়তার সময় মোটেও এমন অবস্থা ছিল না। ছড়ানো-ছিটানো শক্তিগুলো বয়ান ও বিবৃতি পর্যন্ত প্রকাশ করতে পারেনি। বরং তারা দেশের সমস্যাবলির প্রকৃত সমাধানের পথ রুদ্ধ করার জন্য তাদের সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে।[১১৫]

যাইনুল আবেদিন বিন আলি এ-সকল আহ্বান, অনুরোধ ও উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করেননি। তিনি তাঁর নিজের পথেই এগিয়েছেন। তিনি শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর আশ্রয়-ছায়ায়ই তাঁর শাসনের স্থায়িত্বদানের বেশি স্বস্তিবোধ করেছেন। নিরাপত্তা সংস্থাগুলো তিউনিসীয় সমাজের যাবতীয় শক্তি ও সংগঠনের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করে রেখেছিল। এমনকি তারা প্রচারমাধ্যম ও সংবাদপত্রও নিয়ন্ত্রণ করত। বিশেষ করে ইন্টারনেটের সাইটগুলোর ওপর তাদের অতিমাত্রার নজরদারি ছিল।[১১৬]

ক্ষমতার সমীকরণে উপর্যুক্ত দলগুলো বাদে বাকি অংশের, অর্থাৎ তিউনিসীয় জাতির ব্যাপারে বলা যায়, বিন আলি তাদের সন্তুষ্টকরণে

---

১১৩ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

১১৪ ماندیلا تونس شاهد على عهد التغيير, আলি বিন আরাফা, www.aljazeera.net, ৭ই জানুয়ারি, ২০১০।

১১৫ "تونس بعد ٢٧ سنة "نهضة" و٢١ سنة "بن علي, মুহাম্মদ জামাল আরাফাহ, আল-ফজর নিউজ, ২৯ শে জুন, ২০০৮, www.turess.com.

১১৬ الحياة السياسية فى تونس .. قرائة أولية, কামাল আল-কাসির, مركز الجزيرة للدراسات, ১৫ই জানুয়ারি, ২০০৯।

সফল হয়েছেন ভেবে বেশ স্বস্তিতে ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, তিউনিসীয় জাতির বসবাস ইতিহাসের বাইরে এবং তারা কোমায় (আচ্ছন্নতা ও গাঢ়নিদ্রায়) রয়েছে, যা তাদের অধিকাংশকেই নিস্তেজ ও নির্জীব করে রেখেছে; ফলে অধিকাংশ মানুষই বিদ্যমান অবস্থায় সন্তুষ্ট যদিও তারা রয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিগিরির ওপর; নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর ডাণ্ডা, কারাগার, উচ্ছেদ, দেশের বাইরে নির্বাসন ইত্যাদির ভয়ে তারা স্বৈরাচার ও উৎপীড়নেও সন্তুষ্ট। শুধু তাই নয়, তিনি ভেবেছিলেন, যেকোনো কাঙ্ক্ষিত বিকল্প ব্যবস্থার ধ্বংসসাধনে এবং কৌতুকাভিনয়কারী ও ভাঁড়দের একটি দলকে—যারা জনগণের পেট ভরাবে না, প্রয়োজন পূরণ করবে না ও পিপাসার্তদের তৃপ্ত করবে না—ছেড়ে রাখার উদ্দেশ্য হাসিলে তিনি সফল...।[১১৭]

যাইনুল আবেদিন বিন আলি ও তাঁর সরকারের, বরং অধিকাংশ বিশ্লেষক ও পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে তিউনিসিয়ার পরিবেশ-পরিস্থিতি এভাবেই সুস্থিত ছিল। নিকটবর্তী সময়ে তিউনিসিয়ায় বাস্তবিক পরিবর্তন সাধনে একটি মোক্ষম সুযোগ ঘটবে বলে কেউ বিশ্বাস করতে পারত না।

২০০৮ সালের শুরুতে কয়েকটি প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের আগ পর্যন্ত এই স্থিতিশীলতার স্বচ্ছতা ও শুভ্রতা কদর্য হয়ে ওঠেনি। তিউনিসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কাফসাহ প্রশাসনিক এলাকা[১১৮]ধীন রাদিফ শহর থেকে বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে। খুব দ্রুতই পার্শ্ববর্তী কয়েকটি শহরে সামাজিক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।[১১৯]

একটি বড় কোম্পানিতে চাকরির পরীক্ষার ফলাফলকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদের আকারে আন্দোলন শুরু হয়। জনগণ (চাকরিপ্রার্থীরা) দেখল যে, এ-পরীক্ষা মোটেই স্বচ্ছ হয়নি এবং এতে কদর্য পর্যায়ের স্বজনপ্রীতি ঘটেছে। ফলে উদ্ভূত ঘটনাবলি দুর্নীতি, কর্মসংস্থানের সুযোগ না-থাকা ও ফসফেটসমৃদ্ধ অঞ্চলে উন্নয়ন-প্রকল্প হ্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে

---

[১১৭] الإسلاميون والانتخابات التونسية: نشارك أم نقاطع؟, খালিদ আত-তারাওয়ালিম, http://www.aljazeera.net, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯।

[১১৮] Gafsa Governorate

[১১৯] http://www.aljazeera.net, ১৮ই জুন, ২০০৮।

পরিণত হয়। এসব প্রতিবাদ কয়েকমাসব্যাপী চলতে থাকে। বিক্ষোভ, কর্মবিরতি ও ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। প্রতিবাদকালে দুইজন নিহত হয়, অসংখ্য লোক আহত হয় এবং কয়েক ডজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিউনিসিয়ার সরকার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের কোমর ভেঙে দেওয়ার পর এসব এলাকায় যারা প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। কিন্তু আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি ছাড়া বাস্তবিক কিছু উপস্থাপন করার সামর্থ্য তাদের ছিল না।[১২০]

দক্ষিণ তিউনিসিয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মুখোমুখি লড়াইসমূহ যাইনুল আবেদিন বিন আলির মনোযোগ আকর্ষণের জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ, সামাজিক অবস্থার অবনতি, জীবনযাত্রার উচ্চমূল্য ও বেকারত্ব বৃদ্ধির জন্য তিউনিসিয়ার জনমণ্ডলী তাঁকেই দোষারোপ করছিল। তিউনিসিয়ার দক্ষিণাঞ্চল, অর্থাৎ খনিসমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হওয়ার অর্থ হলো নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যদের ওপর বিক্ষোভকারীদের পাথর ও জ্বলন্ত কাচ ছুড়ে মারা। তা ছাড়া নিরাপত্তা সংস্থাগুলো যে-অঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা করে সেই অঞ্চলটিকে জোরপূর্বক তাদের কব্জায় পুরে নেয়। এসব ব্যাপার থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, ওখানে জনমণ্ডলীর ভিড়বহুল সমাবেশ ঘটেছে এবং পুলিশি পাকড়াও বোতলের মধ্যে ফেনিয়ে-ওঠা ক্রোধ ধরে ফেলতে সক্ষম হয়নি।[১২১]

বিপরীত দিকে কিন্তু বিন আলির সরকার তাদের আগের নীতিতেই অটল থাকে। মানুষ যেসব কথাবার্তা ঘৃণা করে সেসব আবেগময় বাক্যরাশিই তারা আওড়াতে থাকে। তারা এই দাবির ওপর গোঁ ধরে থাকে যে, তিউনিসীয় অর্থনীতি ভালো ও সুস্থ আছে। বিন আলি তাঁর শাসনামলে যেসব অর্থনৈতিক নীতিমালা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন সেগুলোকে তারা 'অর্থনৈতিক মুজিযা' বলে আখ্যায়িত করে।[১২২]

---

[১২০] http://www.aljazeera.net, ১৮ই জুন, ২০০৮।

[১২১] "تونس بعد ٢٧ سنة "نهضة" و٢١ سنة "بن علي", মুহাম্মদ জামাল আরাফাহ, আল-ফজর নিউজ, ২৯ শে জুন, ২০০৮, www.turess.com.

[১২২] تونس.. "معجزة" لا تخفي العجز, www.aljazeera.net, ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১০।

কিন্তু সে-সময় সরকারি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছিল যে, ২০০৯ সালে বেকারত্বের হার বেড়ে ১৪.৭% হয়েছে, অথচ ২০০৭ সালে বেকারত্বের হার ছিল ১৪.১%।[১২৩]

তিউনিসিয়ার সরকার-বিরোধী গ্রুপগুলো জোর দিয়ে বলে যে, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের হার সরকার যা ঘোষণা করেছে তার থেকে অনেক বেশি। তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত একটি জরিপে দেখানো হয় যে, তিউনিসিয়ায় উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদধারীদের মধ্যে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন শ্রেণির বেকারত্বের হার ৭০% এবং কৃষি-প্রকৌশলী শ্রেণির বেকারত্বের হার ৩১%। তিউনিসিয়ার মধ্য, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম জেলাগুলোয় বেকার জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগের বসবাস।

২০০৫ সালের পরিবারের জীবনযাপনের মান এবং ব্যয় ও ভোগ-সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজ জোরালোভাবে দেখিয়েছে যে, তিউনিসিয়ার মধ্য-পশ্চিম এলাকাগুলোতে দরিদ্রতার হার অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৮%-এ পৌঁছে গেছে। গোটা দেশের দরিদ্রতার হারের তুলনায় এটা তিনগুণেরও বেশি। দেশে দারিদ্র্যের হার ৩.৮%।[১২৪]

ঋণের পরিধি কী ছিল তা বুঝতে গেলে বলা যায়, ২০০৭ সালে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তিউনিসিয়ার ঋণদায় ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) উল্লেখ করেছে যে, ২০০৫ সালে তিউনিসিয়ার ঋণের অনুপাত ছিল তার মোট জাতীয় উৎপাদনের[১২৫] ৬৮%।

তিউনিসিয়ার অর্থনীতির এমন অবস্থা সত্ত্বেও সরকারের উদ্দেশ্য ছিল দেশের অর্থনীতির চেহারাকে সুসজ্জিতরূপে উপস্থাপন করা। এর জন্য

---

১২৩ আরব লেবার ওর্গানাইজেশন (منظمة العمل العربية) থেকে প্রকাশিত কার্যবিবরণ, alolabor.org.

১২৪ تونس.. "معجزة" لا تخفي العجز, www.aljazeera.net, ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১০।

১২৫ gross national product (GNP)

তারা রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে যেসব বিবৃতি ও বক্তব্য প্রদান করছিল সেগুলোতে কৌতুক ও ছলনার আশ্রয় নিতে বেশ উদ্‌গ্রীব ছিল।[১২৬]

আমরা তিউনিসিয়া সম্পর্কে গোপনীয় মার্কিন দলিল-দস্তাবেজে (ডকুমেন্টে) যা বলা হয়েছে তা এখানে উল্লেখ করব। এসব দলিল পরবর্তী সময়ে উইকিলিকসে ফাঁস করা হয়েছে। এসব দলিলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যাইনুল আবেদিন বিন আলির সরকারের ঘনিষ্ট সার্কেল ও পরিচিত বৃত্তের মধ্যে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষের রমরমা অবস্থা বিরাজ করছে। উইকিলিকসে ফাঁস-করা দলিলে প্রেসিডেন্টকে ঘিরে গড়ে-ওঠা চক্রকে মাফিয়ার সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে যে তারা 'প্রায় মাফিয়া'।[১২৭]

তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে নীতি ও পদ্ধতি নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন, নিরবচ্ছিন্নভাবে তার ওপরই অটল ছিলেন। এ-ব্যাপারে উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে বারংবার অবতীর্ণ হওয়ার ঘৃণ্য দৃশ্য। সংবিধান পরিবর্তন করে ২০০৪ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হন এবং পাঁচ বছরের জন্য তিউনিসিয়ার ক্ষমতা দখল করে নেন। ২০০৯ সালের নির্বাচনেও একই ঘটনা ঘটে। তিনি ৮৯.৬২% ভোট পেয়ে বিজয়ী হন এবং পঞ্চমবারের মতো রাষ্ট্রক্ষমতা কব্জা করে নেন। তাঁর ক্ষমতাসীন দল তিউনিসিয়ার পার্লামেন্টে ১৬১ আসন লাভ করে।[১২৮]

প্রেসিডেন্ট যাইনুল আবেদিন বিন আলি পঞ্চমবারের মতো রাষ্ট্র-নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। দেশ-পরিচালনায় তাঁর নীতি ও পদ্ধতি অটুট ও অক্ষত থাকবে বলে তিনি নিরাপত্তা ও স্বস্তি বোধ করেন। ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরে রাখতে হলে বজ্রমুঠি ও লৌহদণ্ড যে-অপরিহার্য সে-ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস ও আস্থা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি বিশ্বজগতের নীতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন, যা বিদ্যমান অবস্থাকে একইভাবে সামনে এগোতে দেয় না।

---

১২৬ المعجزة الاقتصادية التونسية .. بين الحقيقة والوهم, মামদুহ ওয়ালি, www.onislam.net/, ১৭ই জানুয়ারি, ২০১১।

১২৭ تونس.. "معجزة" لا تخفي العجز, www.aljazeera.net, ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১০।

১২৮ আশ-শার্‌ক আল-আওসাত, লন্ডন, ২৭ শে অক্টোবর, ২০০৯, সংখ্যা ১১২৯১।

Contents

বিপ্লব!

১৭ই ডিসেম্বর, শুক্রবার। তিউনিসিয়ার নাগরিক মুহাম্মদ আল-বুআযিযি সিদি বুযিদের প্রশাসনিক ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। শহরটি রাজধানীয় তিউনিসের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। আল-বুআযিযি একজন ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা। তিনি গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবেন। পুলিশ তাঁকে অসংখ্য মানুষের সামনে চড় মেরেছে এবং পৌরসভার দায়িত্বশীল লোকেরা তাঁর হাতে-ঠেলা দুই চাকার গাড়িটি ভেঙে দিয়েছে। তিনি এই গাড়িতে করে সবজি ও ফল বিক্রি করতেন। তাঁর চেষ্টা ছিল কিছু অর্থ উপার্জন করার এবং বেকারত্বের ফলে কঠিন হয়ে-পড়া জীবনযাত্রাকে কৌশলে বাগে আনার; যদিও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার সনদধারী যুবক।[১২৯]

এখানে আমরা সেই কাহিনিরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখি যা আরব বিশ্বের কয়েকটি দেশে হরহামেশাই ঘটে থাকে। মুহম্মাদ আল-বুআযিযি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। বেকারত্ব তাঁকে হাতে-ঠেলা গাড়িতে সবজি ও ফল বিক্রেতার মতো কাজ করতে বাধ্য করেছে। আরব দেশগুলোতে তাঁর মতো মিলিয়ন মিলিয়ন যুবক রয়েছে। পৌরসভার কর্মচারীরা এমন যুবকেরই সবজি ও ফলের ট্রলি ভেঙে দিতে এসেছে এবং এতে যা-কিছু সব নষ্ট করে দিয়েছে। তাঁর জীবনজীবিকার একমাত্র উৎসটিকে ভাঙচুর থেকে রক্ষা করতে গেলে তাঁর সঙ্গে সহিংস আচরণ করেছে, অপমান করেছে এবং তাঁকে মেরেছে। গোটা আরব বিশ্বে এমনসব ঘটনাই ঘটে চলছে।

---

[১২৯] محمد البوعزيزي.. مأساة البطالة تونسيا وعربيا, আহমদ সাইয়িদ আন-নাজ্জার, আল-আহরাম, ২৩ শে ডিসেম্বর, ২০১০, সংখ্যা ৪৫৩০৭; http://www.ahram.org.eg/Archive/390/2010/12/23/4/54601.aspx.

Contents

স্বাভাবিকভাবেই গভর্নর মুহাম্মদ আল-বুআযিযির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর মতো অধিকাংশই গভর্নরেরই চরিত্র এমন এবং আরব বিশ্বের অধিকাংশ দেশে স্থানীয় প্রশাসনের এটাই বৈশিষ্ট্য।

তিউনিসীয় যুবক মুহাম্মদ আল-বুআযিযি ১৯৮৪ সালের ২৯ শে মার্চ সিদি বুযিদ প্রশাসনিক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের সদস্য ৯ জন; তাদের মধ্যে একজন প্রতিবন্ধী। আল-বুআযিযি এই অপমান সহ্য করতে পারেননি। এই অপমানের সূচনা ঘটেছে যখন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ মূল্যায়িত হয়নি তখন থেকেই। তিনি তাঁর উপযুক্ত চাকরি পেতে হতাশ হয়েছেন। তাঁর পরিবেশ-পরিস্থিতি তাঁকে এমন পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য করেছে যা তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শুধু তাই নয়, এখন দেখা যাচ্ছে এ-পথেও তাঁর সামনে বাধা রয়েছে এবং তাঁকে হালাল উপার্জন থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ফলে গোটা দুনিয়া তাঁর সামনে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং হাবিব বুরগিবা ও বিন আলির শাসনামলে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যে-ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি তাঁকে গেলানো হয়েছে তা তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে না...তিউনিসিয়ার সমাজে জীবন ও রাষ্ট্র থেকে দ্বীনের দূরীকরণ তাঁকে শান্ত রাখতে পারে না...তিনি কোনো কল্যাণকামী শায়খের দেখা পান না...সৎ মানুষের সঙ্গও পান না যে তাঁকে তাঁর সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে...আল-বুআযিযি তখন কী করলেন?

তিউনিসীয় যুবক তখন আত্মহত্যার পথে এগিয়ে গেলেন!!

তিনি পৌঁছে গেলেন হতাশার শিখরে এবং নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিলেন!!

ঘটনার ঘনঘটা

যুবক আল-বুআযিযিকে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলো। তাঁর আত্মহত্যার ঘটনা তিউনিসীয় জাতির অস্তিত্বকে প্রচণ্ডভাবে নাড়িয়ে দিল। তাঁর সঙ্গীসাথিরা সর্বপ্রথম ক্রোধে জ্বলে উঠল। তারা সিদি বুযিদের প্রশাসনিক ভবনের সামনে সমবেত হলো। তারা এই জালিম সরকার থেকে তাদের অধিকার ও তাদের বন্ধুর অধিকার আদায়ে প্রত্যাশায়

উদ্দীপ্ত। এই গভর্নর তাদের সামনে জালিম সরকারেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভরত বিক্রেতাদের সঙ্গে শত শত ক্ষুব্ধ যুবক সমবেত হলো। ফলে নিরাপদ সংস্থার লোকেরা বিপদ বোধ করল। তারা এই ক্ষুব্ধ জনতার সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করল। স্বাভাবিক কারণেই অবস্থা আরও বেগতিক হলো। এমন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে পাওয়া গেল না যিনি সিদি বুযিদ শহরে নিরাপত্তা সংস্থার সদস্য ও তিউনিসীয় জনমণ্ডলীর মুখোমুখি লড়াইয়ের পেছনের কারণগুলো খতিয়ে দেখবেন। কয়েকটি গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হলো। কয়েক ডজন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হলো। এই প্রশাসনিক এলাকায় সরকারি ভবনগুলোতে হামলা হলো, তার কয়েকটি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। এই হলো এ-শহরে জনমণ্ডলীর সঙ্গে সরকারের মুখোমুখি লড়াইয়ের ফলাফল।[১৩০]

অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রে শাসকেরা যে-পন্থা অবলম্বন করে অভ্যস্ত বিন আলি সেই পন্থাই অবলম্বন করলেন। বিন আলির সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়; বিশেষ করে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ স্তিমিত করতে গেলে প্রচণ্ড পুলিশি আক্রমণ অত্যাবশ্যক। সিদি বুযিদ শহরটিকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপত্তা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। অথচ এই বিপর্যয়কর সমস্যার বাস্তবিক ও স্থায়ী সমাধানের জন্য বেকারদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জীবনযাপনের গ্লানি ও দারিদ্র্যের নরক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সম্মানের সঙ্গে জীবিকা উপার্জনের সম্ভাবনা তৈরির বিকল্প ছিল না।[১৩১]

সিদি বুযিদের একজন বাসিন্দা ও এসব ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী বিক্ষোভের বিরুদ্ধে সরকারের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলেন, অন্যান্য প্রশাসনিক এলাকা থেকে এই শহরে নিরাপত্তা সংস্থার জন্য বিপুল পরিমাণ সহায়ক শক্তি প্রেরণ করা হলো। ৬ হাজার পাঁচ শ'র চেয়েও বেশি নিরাপত্তা-সদস্য

---

[১৩০] আশ-শারক আল-আওসাত, ২১ শে ডিসেম্বর, ২০১০, সংখ্যা ১১৭১১।

[১৩১] محمد البوعزيزي.. مأساة البطالة تونسيا وعربيا, আহমদ সাইয়িদ আন-নাজ্জার, আল-আহরাম, ২৩ শে ডিসেম্বর, ২০১০, সংখ্যা ৪৫৩০৭; http://www.ahram.org.eg/Archive/390/2010/12/23/4/54601.aspx.

মোতায়েন করা হলো। নিরাপত্তা বাহিনীর কর্তৃপক্ষ যেকোনো পন্থায় সমস্যা সমাধানের জন্য সময়ের সঙ্গে টেক্কা দিল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্লাসরুমে ফেরার আগেই তারা এসব কাণ্ড করল। তাদের কর্মকাণ্ড উত্তেজনা ও বিক্ষোভের আগুনে ঘি ঢালল এবং গোটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল...।[১৩২]

যাইনুল আবেদিন বিন আলির সরকার কোনো চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিল। তিনি সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করলেন যা তিনি নিপুণভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে পারবেন। তা ছাড়া এমন পদ্ধতি অবলম্বনের ফলেই তিনি তিউনিসিয়ার সিংহাসনে এই মুহূর্ত পর্যন্ত টিকে আছেন...।

কিন্তু এইবার নতুন ঘটনা ঘটেছে; গণবিক্ষোভ গুটিয়েও যায়নি, চুপসেও যায়নি। বিন আলি ও তাঁর অনুগামীরা যা ভেবেছিলেন; বরং বিক্ষোভের আগুন বেড়েই চলছে!!

২০১০ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সিদি বুযিদ শহরে জনবিক্ষোভের ওপর প্রথম গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে...।[১৩৩] নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন।

আল্লাহ তাআলা তিউনিসীয় জাতির প্রতি বিন আলির যে-ধারণা তা মিথ্যা প্রমাণ করতে চাইলেন। মানুষজন তাদের ভাই-বেরাদর অর্থাৎ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের গুলির সামনে থেকে পালিয়ে গেল না। এই ঘৃণ্য ঘটনা জনবিক্ষোভকে আরও উত্তেজিত করে তোলে। তা এক অগ্নিগর্ভ প্রতিবাদ বিক্ষোভে রূপ নেয়। সিদি বুযিদ প্রশাসনিক এলাকা ছাড়িয়ে তা রাজধানী তিউনিস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তিউনিসে শত শত যুবক বেকারত্ব নিরসনের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তারা সিদি বুযিদের যুবকদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। তিউনিসে বেকার যুবকদের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যরা, মানবাধিকারকর্মীরা, ছাত্ররা ও ব্লগাররাও যুক্ত হয়...।[১৩৪]

---

[১৩২] আশ-শারক আল-আওসাত, ২১ শে ডিসেম্বর, ২০১০, সংখ্যা ১১৭১১।

[১৩৩] আশ-শারক আল-আওসাত, লন্ডন, ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১০, সংখ্যা ১১৭১৬।

[১৩৪] আশ-শারক আল-আওসাত, লন্ডন, ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১০, সংখ্যা ১১৭১৬।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তিউনিসে সমবেত তরুণ-যুবকেরা নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর দমন-পীড়ন বন্ধের জরুরি দাবি জানায়। তারা আশঙ্কা করছিল যে, তা না হলে অবস্থা আরও জটিল ও গুরুতর হবে...।

কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য এবং বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যাইনুল আবেদিন বিন আলির হাতে নিরাপত্তা বাহিনীর লাঠ্যৌষধি ছাড়া কি কিছু ছিল?

বিন আলি অগ্নিদগ্ধ মুমূর্ষু যুবককে হাসপাতালে দেখতে যাওয়ার কৌশল অবলম্বন করে তিউনিসীয় জাতির সহানুভূতি নিংড়ানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এই প্রতারণাপূর্ণ আচরণ তিউনিসিয়ার জনমণ্ডলীকে ধোঁকায় ফেলতে পারেনি। নিরাপত্তা বাহিনীর সহিংস আচরণ ও মোকাবিলা এবং যুবকদের লাশের পর লাশ পড়লেও প্রতিবাদ-বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। অবশেষে বিন আলি দিন দিন চরম পর্যায়ে পৌঁছতে যাওয়া বিপর্যয়কে মাটিচাপা দেওয়ার জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানের ঘোষণা দেন...।

২৯ সে ডিসেম্বর বিন আলি সীমিত আকারে মন্ত্রণালয়-সংশোধনী জারি করেন। সংশোধনীতে পাঁচটি মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় : যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। একইভাবে বিন আলি মন্ত্রীসভায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রস্তুত করার দাবি তোলেন। যাতে যে-সকল যুবক উচ্চশিক্ষার সনদধারী হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে বেকার রয়েছে তাদের চাকরি ও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া যায়। কিন্তু তিনি প্রতিবাদ-বিক্ষোভ জরুরিভাবে থামিয়ে দেওয়া ব্যাপারটি জোর দিয়ে উল্লেখ করতে ভোলেননি। কারণ, এসব প্রতিবাদ-বিক্ষোভে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা হলো উগ্রতাবাদী ও দেশের স্বার্থবিরোধী ভাড়াটে উসকানিদাতা মুষ্টিমেয় কিছু লোক।[১৩৫]

বোঝা গেল যে, যাইনুল আবেদিন বিন আলি যেসব পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তা যথেষ্ট নয়। প্রতিবাদ-বিক্ষোভ অব্যাহতই থাকল। অর্থাৎ, তিউনিসিয়ার জনমণ্ডলী বিন আলি ধোঁকাবাজি ও প্রতারণাপূর্ণ কৌশলসমূহ ভালোই বুঝে গিয়েছিল। তারা জোর দিয়ে বলল যে, এসব সুযোগ-সুবিধা

---

[১৩৫] রাশিয়ান নিজউ এজেন্সি (TASS), ২৯ শে ডিসেম্বর, ২০১০।

দানের একটিমাত্র উদ্দেশ্যই হতে পারে। তা হলো তাদের আওয়াজ স্তব্ধ করে দেওয়া এবং তাদের বিপ্লবকে নিস্তেজ করে দেওয়া। তার পরক্ষণেই তিনি আর প্রকৃত মূর্তি বরং তার চেয়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করবেন..।

জাতির অব্যাহত বিক্ষোভের সামনে বিন আলি আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার দানের ঘোষণা দিতে বাধ্য হন। বিক্ষুব্ধ জনতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টায় তিনি ৩০ শে ডিসেম্বর সিদি বুযিদের গভর্নরকে বরখাস্ত করেন...।

পরিস্থিতি শান্ত হয় না; বরং উত্তাপ ও উত্তেজনা আরও বেশি বেড়ে যায়। জনবিক্ষোভে নতুন উপাদান যুক্ত হয়। তা হলো ছাত্রদের বিক্ষোভ। প্রায় ২৫০ জন্য ছাত্র বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে। তাদের অধিকাংশই ছিল মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্র। রাজধানী তিউনিসে একটি শান্তিপূর্ণ পদযাত্রায় তারা সিদি বুযিদে বেকারত্ব ও জীবনযাত্রার উচ্চমূল্য-বিরোধী যে-বিক্ষোভ আন্দোলন চলছে তার সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু ছাত্রদের এই পদযাত্রা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে রূপ নেয়।[১৩৬]

২০১১ সালের ৪ই জানুয়ারি মঙ্গলবার মুহাম্মদ আল-বুআযিযি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ামাত্রই জনতা প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠে। আল-বুআযিযির মৃত্যু সিদি বুযিদে নতুনভাবে বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এরপর এই বিক্ষোভ রাজধানী তিউনিসসহ সোসা (Sousse), সাফাকিশ (Sfax), কাফসাহ (Gafsa), আল-কাসরাইন (Kasserine), আল-কাফ (Kef) ও কাবিস (Gabès) প্রশাসনিক এলাকাগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে।[১৩৭]

যাইনুল আবেদিন বিন আলি টেলিভিশনের স্ক্রিনে ফিরে আসেন এবং ১০ই জানুয়ারি সোমবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি অভিযোগ করেন, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির পেছনে কতিপয় বহিঃশক্তি (দল) ও অপরিচিত দুর্বৃত্তদের হাত রয়েছে। বেকারত্ব দূরীকরণে তিনি কতিপয়

---

[১৩৬] المصري اليوم (মিসরীয় দৈনিক সংবাদপত্র), ৫ই জানুয়ারি, ২০১১, সংখ্যা ২৩৯৭।

[১৩৭] وفاة البوعزيزي مفجر احتجاجات تونس, www.aljazeera.net, ৫ই জানুয়ারি, ২০১১।

সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিউনিসিয়ায় ছড়িয়ে-পড়া প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছাড়া কিছু নয়!

স্বাভাবিক কারণেই প্রেসিডেন্ট বিন আলি তাঁর বক্তব্যে জনতার বিক্ষোভ-প্রতিবাদকে সন্ত্রাসী ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করে যাচ্ছিলেন। এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে ভিনদেশি দালালদের যোগসাজশ রয়েছে বলে অভিযোগ করছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, নিরাপত্তা বাহিনী ও সংস্থাগুলো এ-সকল দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের দমনে তাদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করেছিল...তিউনিসিয়ার তালাত শহরে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিবর্ষণে ৮ বিক্ষোভকারী নিহত হন! এই সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।[১৩৮]

কিন্তু (এই সংবাদে ভীত হয়ে) বিক্ষোভকারীরা থেমেও যায়নি, ঘরেও ফিরে যায়নি! ফলে তিউনিসীয় সরকারের একজন মুখপাত্র সরকারের পক্ষ থেকে ১১ জানুয়ারি মঙ্গলবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে বলা হয়, বিক্ষোভকারীদের বার্তা তাদের কাছে পৌঁছেছে। এতে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, জীবনযাত্রার নিম্নমান ও দুর্বিষহ অবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের প্রতিকার ও সৃষ্ট অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও সংশোধনমূলক কর্মকৌশল গ্রহণ করেছেন।[১৩৯]

এরপর প্রেসিডেন্ট বিন আলি দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলিবর্ষণে অভিযুক্ত করে বরখাস্ত করেন। ঠিক একই সময়ে রাজধানী তিউনিসের পশ্চিম উপশহরে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সেনা মোতায়েন করা হয়। সন্ধ্যার পর কার্ফ্যু (চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা) জারি করা হয়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বরখাস্তের ঘটনা ঘটে এমন সময়ে যখন সরকারের বিরোধী দলীয় বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, সেনাবাহিনীর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল রশিদ আম্মারকে বরখাস্ত করা হয়। কারণ, তিনি দেশজুড়ে ছড়িয়ে-পড়া বিক্ষোভ দমনে সৈনিকদের নির্দেশদানের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন এবং ক্ষুব্ধ তিউনিসীয় জনমণ্ডলীর বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ে

---

[১৩৮] আল-আহরাম, ১০ই জানুয়ারি, ২০১১, সংখ্যা ৪৫৩২৫;

[১৩৯] আল-আহরাম, ১১ই জানুয়ারি, ২০১১, সংখ্যা ৪৫৩২৬;

সেনাশক্তিকে কাজে লাগানোর পরিবর্তে তিনি সতর্কতামূলক অবস্থান গ্রহণ করেন।[১৪০]

অবশেষে ফেরআউনের সিংহাসন ঝাঁকি খেয়ে ওঠে..

আমি আপনাদের বুঝেছি

বিন আলি ১৩ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার আরও একবার টেলিভিশনের স্ক্রিনে দেখা দেন। তিনি এক অভূতপূর্ণ ভাষণ দেন। ভাষণে ঘোষণা করেন, অবশেষে তিনি তিউনিসীয় জাতিকে বুঝতে পেরেছেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন, জাতির সমস্ত দাবি পূরণে তিনি সচেষ্ট হবেন; আসন্ন ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন না; স্বাধীন দুর্নীতি তদন্ত (ও দমন) কমিশন গঠন করবেন; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবেন এবং ইন্টারনেটের সাইটগুলোর ওপর থেকে নজরদারি উঠিয়ে নেবেন...।

বিন আলি ঘোষণা করেন, তিনি নিত্যপ্রয়োজনীয় মৌলিক পণ্যের মূল্যহ্রাসে সরকারকে বাধ্য করবেন। এসব পণ্যের মধ্যে রয়েছে চিনি, রুটি ও দুধ...।

বিন আলি উপলব্ধি করেন, তিউনিসিয়ায় যে-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা গভীর ও সামগ্রিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে। আর যে-পরিবর্তনের ব্যাপারে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। অর্থাৎ, তিউনিসীয় জাতির দাবিসমূহ মেনে নেওয়া তা স্ববিরোধী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে এবং যা ঘটেছে তা জন্য তাকে প্রচণ্ড যন্ত্রণা পোহাতে হবে।[১৪১]

বিন আলির পলায়ন

২০১১ সালের ১৪ই জানুয়ারি, শুক্রবার। তিউনিসিয়ার নাগরিকদের কাছে, আরব দেশগুলোতে ও গোটা ইসলামি বিশ্বে একটি সুসংবাদের হাওয়া বয়ে যায়...বিন আলি পালিয়ে গেছেন...। জুমার দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার

---

[১৪০] আশ-শারক আল-আওসাত, ১৩ই জানুয়ারি, ২০১১, সংখ্যা ১১৭৩৪।

[১৪১] আল-মুসতাকবাল (লেবাননের দৈনিক সংবাদপত্র), শুক্রবার, ১৪ই জানুয়ারি, ২০১১, সংখ্যা ৩৮৮২।

দিকে তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আল-গানুশি ঘোষণা করেন, যাইনুল আবেদিন বিন আলি শাসনক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং তিনি সাময়িকভাবে দেশটির রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

মুহাম্মদ আল-গানুশি রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে একটি বিবৃতি পাঠ করেন। এই সময় তাঁর দুই পাশে ছিলেন চেম্বার অফ ডিপুটিস্-এর প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ ফুয়াদ আল-মুবাযযা এবং চেম্বার অফ অ্যাডভাইসর্স্-এর প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ আল-কালাল। বিবৃতিতে মুহাম্মদ আল-গানুশি বলেন, 'সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী' তিনি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে তাঁর দায়িত্বপালনে অপারগ হলে' (প্রধানমন্ত্রী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করবেন)।

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি বিন আলি সাময়িকভাবে তাঁর দায়িত্বপালনে অপারগ হওয়ার বিবেচনায় আমি এখন থেকে দেশটির রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করলাম। আমি রাজনৈতিক ও আদর্শিক দল-মত-পথ নির্বিশেষে সকল দলের ও উপদলের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাই। যাতে আমাদের সকলের প্রিয় দেশ এসব কঠিন সংকট ও জটিলতা থেকে উত্তরণে সক্ষম হয়।[১৪২]

বিন আলি মাল্টার উদ্দেশে তিউনিসের বিমানবন্দর ত্যাগ করে। তার আগে ফ্রান্স ঘোষণা দিয়েছে যে তারা বিন আলিকে কিছুতেই স্বাগত জানাবে না। কথিত আছে, এরপর তিনি আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের একটি দেশে গমন করেন। ওখানে তিনি অপেক্ষায় থাকেন কোনো একটি দেশ হয়তো তাঁকে স্বাগত জানাবে...।

অবশেষে তিনি সৌদি আরবে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন...।

তিউনিসিয়া থেকে বিন আলির পলায়নের সংবাদ দেশে ও আরব বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অধিকাংশ প্রতিক্রিয়ায়

---

[১৪২] আল-মুসতাকবাল, শনিবার, ১৫ই জানুয়ারি, ২০১১, সংখ্যা ৩৮৮৩।

তিউনিসীয়দের অভিপ্রায় ও তিউনিসিয়ান ন্যাশনাল ডায়ালগ[১৪৩]-এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা 'তিউনিসিয়ান জাতির সাহস ও আত্মমর্যাদাবোধে'র প্রশংসা করেন। স্বাধীন ও বিধিসম্মত নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়াবে। যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য তিউনিসীয় জাতির সাহসী লড়াই প্রত্যক্ষ করেছি। যে-তিউনিসীয় জাতি তাদের আওয়াজ বিশ্বদরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে আমরা সময়সময় তাদের স্মরণ করব।

ফ্রান্স তিউনিসিয়ার পরিস্থিতি শান্ত হবে ও সহিংসতার সমাপ্তি ঘটবে বলে আশা ব্যক্ত করে। তারা জোর দিয়ে বলে, 'ন্যাশনাল ডায়ালগ-এর একার পক্ষেই বর্তমান সংকটের গণতান্ত্রিক ও স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করা সম্ভব।'

একইভাবে জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি মুন সংকটের গণতান্ত্রিক মীমাংসা খোঁজা এবং বাক্ ও সমাবেশের স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আহ্বান জানান।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন তিউনিসিয়ার সমস্যার গণতান্ত্রিক ও স্থায়ী সমাধান এবং দেশ থেকে যাইনুল আবেদিন বিন আলির বেরিয়ে যাওয়া পর শান্তি বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানায়।

ব্রিটেনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, তিউনিসিয়া এখন এক ঐতিহাসিক সময় যাপন করছে। তিনি তিউনিসিয়ানরা যে গত কয়েক

---

১৪৩ GwU Tunisian National Dialogue Quartet (الرباعي التونسي للحوار الوطني) নামে পরিচিত। তিউনিসিয়ার সিভিল সোসাইটির চারটি সংগঠন এর অন্তর্ভুক্ত :

১. The Tunisian General Labour Union (UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail)
২. The Tunisian Confederation of Industry, Trade and Handicrafts (UTICA, Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat)
৩. The Tunisian Human Rights League (LTDH, La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme)
৪. The Tunisian Order of Lawyers (Ordre National des Avocats de Tunisie)

সপ্তাহে তাদের অভিব্যক্তির দুর্দান্ত প্রকাশ ঘটিয়েছে তার প্রতি ইঙ্গিত করেন।

জার্মানি আগ্রহী গ্রুপগুলোকে সংলাপ চালু ও সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করতে আহ্বান জানায়, যাতে সহিংসতা বৃদ্ধি না পায় এবং মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়।[১৪৪]

আরব বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে কেবল কাতার প্রতিক্রিয়া জানায়। কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে তিউনিসীয় জাতির অভিপ্রায় ও তাদের ইচ্ছাস্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। কাতারের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা উদ্ধৃত করে যে, 'কাতার প্রিয় তিউনিসীয় জাতির সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং তিউনিসিয়া প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব।'[১৪৫]

কাতার ব্যতীত আরব বিশ্বের অন্য দেশগুলো বিমর্ষতায় কাতর হয়ে মৌনতা অবলম্বন করে। তারা মূলত তিউনিসীয় বিপ্লবের পরিণতি বরণ করতে অপেক্ষা করছিল।

প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির ঘোষণার মধ্য দিয়ে লিবিয়া তার মৌনতা ভাঙে। তিনি সিংহাসনচ্যুত প্রেসিডেন্ট বিন আলির তিউনিসিয়ার শাসনক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের দাবি জানান। তিনি তিউনিসীয় জাতিকে উদ্দেশ্য করে যেসব কথা বলেন তা লিবিয়ার টেলিভিশন প্রচার করে :

আপনাদের রাষ্ট্রনায়ক যদি কোনো ভুল করে থাকে তবে আপনারা তার সংশোধন করে নিন। তারপর তিনি প্রজাতন্ত্রী তিউনিসিয়ায় যা ঘটেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।[১৪৬]

আরব রাষ্ট্রগুলোর সরকারের কথা বাদ দিলে আরব জনমণ্ডলী তিউনিসীয় বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছে এবং বিপ্লবের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছে। আরব বিশ্বের বিভিন্ন গ্রুপ ও সংগঠন, বিশেষ করে সিভিল সোসাইটির গ্রুপ ও সংগঠন তিউনিসীয় 'জাতির বিপ্লব'কে স্বাগত জানায়।

---

[১৪৪] www.aljazeera.net, ১৫ই জানুয়ারি, ২০১১।

[১৪৫] আল-মুসতাকবাল, শনিবার, ১৫ই জানুয়ারি, ২০১১, সংখ্যা ৩৮৮৩।

[১৪৬] আল-আহরাম, ১৬ই জানুয়ারি, ২০১১, সংখ্যা ৪৫৩৩১।

এই বিপ্লবই স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট যাইনুল আবেদিন বিন আলির পতন ঘটিয়েছে। এসব সংগঠন আরব নেতাদেরকে তিউনিসিয়ার বিপ্লব থেকে শিক্ষাগ্রহণের আহ্বান জানায়। হারাকাত আল-মুকাওয়ামাত আল-ইসলামিয়্যাহ[১৪৭] (হামাস) ও হারাকাত আল-জিহাদ আল-ইসলামি ফি ফিলিস্তিন তিউনিসীয় জাতির অভিপ্রায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

মিসরের বুদ্ধিজীবী, লেখক, সাংবাদিক ও বিশিষ্ট নাগরিকদের একটি গোষ্ঠী তিউনিসীয় জাতির প্রতি তাদের বিপ্লব ও অভ্যুত্থানে সংহতি জ্ঞাপন করে; যে-বিপ্লব ছিল স্বৈরাচার, জুলুম, দুর্নীতি, উৎপীড়ন ও সম্মান হারানোর বিরুদ্ধে।[১৪৮]

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ মুসলিম স্কলারস[১৪৯]-এর সভাপতি শায়খ ইউসুফ আল-কারযাবি তিউনিসীয় জাতির বিপ্লবের প্রশংসা করেন। এই বিপ্লব যাইনুল আবেদিন বিন আলিকে পদচ্যুত করে ছেড়েছে। তিনি তাদের স্বৈরাচারীর পতনের পর এ-সরকারের অন্য রাঘব বোয়ালদের পতনের মধ্যে এই সফর পূর্ণ করতে আহ্বান জানান।

কারযাবি বলেন, 'সবচেয়ে বড় দেবতা হুবালের পতনের পর তার চারপাশে ঘিরে থাকা লাত ও উযযার মতো উপদেবতাদেরও পতন ঘটানো উচিত। বছরের পর বছর ধরে তিউনিসীয়দের পীড়নকারী স্বৈরশাসনের খেদমতগার ও চেলাচামুণ্ডাদেরও পতন আবশ্যক।' তিনি বিন আলির শাসনামলে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আল-গানুশির অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের দায়িত্ব নেওয়ারও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, 'যে-ব্যক্তির সরকারকে মুষ্টিমেয় লোক ধ্বংস করে দিয়েছে তিনি (তিউনিসিয়ার বর্তমান সংকটময় সময়ে) দেশ-রক্ষাকারী সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত নন।' তিনি এমন একটি নতুন সরকার গঠনের আহ্বান জানান যেখানে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের কারও অংশগ্রহণ থাকবে না।[১৫০]

---

১৪৭ ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন / Islamic Resistance Movement

১৪৮ ترحيب شعبي عربي بثورة تونس, www.aljazeera.net, ১৬ই জানুয়ারি, ২০১১।

১৪৯ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين

১৫০ www.aljazeera.net, ১৬ই জানুয়ারি, ২০১১।

তিউনিসিয়ার প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আল-গানুশি জাতীয় ঐক্যভিত্তিক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা দেন। এই সরকার দ্রুততম সময়ে অর্থাৎ ছয় মাসের মধ্যে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করবে। এই সরকারে নিবন্ধিত দলসমূহের নেতৃবৃন্দ, স্বতন্ত্র ব্যক্তিবর্গ, ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীবৃন্দ ও মানবাধিকার-কর্মীদের অংশগ্রহণ থাকবে। তবে কয়েকটি রাজনৈতিক দল—যেগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে—পরামর্শ ও সরকার গঠনের প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকবে, যেমন তিউনিসিয়ার আন-নাহদা ইসলামি আন্দোলন![১৫১]

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, যেমন : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ইত্যাদি। এ-সরকারে অংশীদার বিরোধী দলগুলোর নেতৃবৃন্দের কর্তৃত্বাধীন থাকবে সাধারণ মন্ত্রণালয়গুলো। উদাহরণত, প্রগ্রেসিভ ডেমোক্রেটিভ পার্টির সাবেক মহাসচিব আহমদ নাজিব আশ-শাবি স্থানীয় উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন...। মুহাম্মদ আল-গানুশি রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার নীতিকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করবেন বলে ঘোষণা দিতে ভোলেননি...।[১৫২]

একই সময়ে তিনি পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট বিন আলির পরিবারের দেশের বাইরে পালিয়ে যাওয়ার আগে দেড় টন সোনা চুরির ঘটনা ফাঁস হয়েছে বলে ঘোষণা দেন।[১৫৩]

তিউনিসিয়ার অন্যান্য পরিস্থিতির উন্নয়ন আমি যখন এই লেখা লিখছি তখনো অব্যাহত ছিল। নতুন সরকার দুটি ব্যাপারে দোটানায় আন্দোলিত হচ্ছিল। তার একটি হলো স্বৈরাচারী সরকারের রাঘব বোয়াল ও চেলাচামুণ্ডাদের বহাল রেখে স্বৈরাচারী শাসন জিইয়ে রাখা; এসব চেলাচামুণ্ডা ও সুবিধাভোগীদের এখনো কোনো জবাবদিহি করতে হয়নি, যদিও তারা বিন আলির শিষ্য। অপরটি হলো যারা পদচ্যুত বিন আলির

---

[১৫১] আশ-শারক আল-আওসাত, ১৭ই জানুয়ারি, ২০১১, সংখ্যা ১১৭৩৮।

[১৫২] আল-মুসতাকবাল, শনিবার, ১৮ই জানুয়ারি, ২০১১, সংখ্যা ৩৮৮৬।

[১৫৩] আল-মুসতাকবাল, শনিবার, ১৮ই জানুয়ারি, ২০১১, সংখ্যা ৩৮৮৬।

Contents

দলের কারও অংশগ্রহণ যে-সরকারে থাকবে সেই সরকারে অংশগ্রহণ করবে না বলে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করছে তাদের দমন করা...।[১৫৪]

তিউনিসিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি সত্যিই জটিল। আমাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

---

[১৫৪] আশ-শারক আল-আওসাত, ২০ শে জানুয়ারি, ২০১১, সংখ্যা ১১৭৪১।

Contents

ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

মহাঘটনা

ইতিহাস এই ঘটনার স্মৃতি পরবর্তী কয়েক শতাব্দীব্যাপী ধারণ করবে, যদি পৃথিবী কয়েক শতাব্দী বেঁচে থাকে! আমি অতিরঞ্জন করে এই কথা বলছি না; বরং আমি কয়েকটি সত্য ও বাস্তবের ভিত্তিতে এ-কথা বলছি। তার একটি এই যে, এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা; ইতিপূর্বে কখনো এমন ঘটনা ঘটেনি। ২. এখনো পর্যন্ত এটি একটি সফল ঘটনা; অতিআশাবাদীরাও এই ঘটনার এমন সাফল্য আশা করেনি। ৩. এই ঘটনার ফলে তিউনিসিয়ার মাটিতে ৫৩ বছর ধরে শেকড় গেঁড়ে-বসা একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটেছে। এই ৫৩ বছরের কালপর্বে দুই স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট হাবিব বুরগিবা ও যাইনুল আবেদিন বিন আলির হতশ্রী ও অন্ধকারাচ্ছন্ন শাসনব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে টিকে ছিল। ৪. এই ঘটনার প্রভাব ও পরিণতি তিউনিসিয়া ছাড়িয়ে অন্যান্য ভূখণ্ডেও ছড়িয়ে পড়েছে। ৫. এই ঘটনার ফলাফল কয়েক দশকব্যাপী সক্রিয় থাকবে, যদি তিউনিসিয়ার জনমণ্ডলী তা সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারে ..।

সত্যিই এটি মহাঘটনা...এ-বিষয়ে আমাদের কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

পরবর্তী আলোচনায় আমি এসব বিশ্লেষণ উপস্থিত করব।

প্রথম পয়েন্ট :

আমি হৃদয়ের গভীরতা থেকে তিউনিসীয় জাতিকে অভিনন্দন জানাই... আমার কী যে সৌভাগ্য—আল্লাহর কসম তা বর্ণনা করা যাবে না... আমি সত্য তা বলতেও পারব না... আমি অনুভব করি যে, আমার সৌভাগ্য স্বয়ং তিউনিসিয়ানদের থেকে বেশি!!

হে তিউনিসিয়ানগণ, আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এটা সম্মানিত ঈদের দিন এবং মহাসুসংবাদের দিন... আমরা এটাকে ঈদের দিন বললে কোনো অতিরঞ্জন হবে না... রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার

দিন রোজা রেখেছেন এবং এই দিনে মুসলমানদের রোজা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, এই দিনে আল্লাহ তাআলা মুসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদেরকে মুক্তি দিয়েছেন এবং খোদাদ্রোহী-স্বৈরাচারী ফেরআউন ও সৈনিকদের ধ্বংস করেছেন। যেকেনো দিনে কোনো স্বৈরাচারী ধ্বংস হবে তা মুসলমানদের ঈদের দিন... আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি মুসলমানদের ঈদ বাড়িয়ে দিন... বিশেষ করে এই আরব জনপদগুলোতে—এখানে স্বৈরাচারীরা ধ্বংসাত্মক অরাজকতা বিস্তার করেছে; এখানে আরব জাতিগুলোর বুকের ওপর স্বৈরাচারীরা যুগের পর যুগ ধরে চেপে বসে আছে... হে আল্লাহ, তুমি তিউনিসিয়া ও তার নাগরিকদের সম্মানিত করো, তাদের তোমার সৈনিকরূপে গ্রহণ করো, মুসলমানদের দেশসমূহে স্বাধীনতার যাত্রাপথে তাদেরকে অগ্রপথিক বানাও।

দ্বিতীয় পয়েন্ট :

জুলুম একটি ভঙ্গুর ব্যবস্থা তৈরি করে, যা মানুষের চোখে শক্তিশালী ও জাঁকালো দেখায়; কিন্তু বাস্তবে তা চূড়ান্ত দুর্বল। মাজলুমরা যদি এই সত্য অনুধাবন করতে পারে তাহলে তাদের ধারণার চেয়েও কম সময়ে তাদের কাঁধ থেকে জুলুমের ভার নামিয়ে ফেলতে পারবে...।

স্বৈরাচারী যাইনুল আবেদিন বিন আলির এমন লাঞ্ছনাকর পলায়ন কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিল?

কারও ধারণায় কি এটা ছিল যে, এক মাসেরও কম সময়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যে তা যুগ যুগ ধরে চলমান (স্বৈরাচারী) কালপর্বের অবসান ঘটাবে?

কেউ এই বিষয়টা ধারণাও করতে পারেনি। অথচ তা—আমার ধারণায় অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার!!

অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, জালিমরা যদিও মানুষের চোখে তাদের শক্তি প্রকাশ পায়—চূড়ান্ত পর্যায়ের দুর্বল। আপনারা এই মূলনীতি মনে রাখুন : যখনই দেখবেন আপনার শত্রু ব্যারিকেডের পেছনে আত্মরক্ষা করছে, জানবেন, আপনি তাকে যতটা ভয় করছেন সে আপনাকে তার চেয়ে বেশি ভয় করছে।' জেনে রাখুন, যখনই কোনো মানুষের পাহারাদার বৃদ্ধি পায়, তা

তার দুর্বলতা বৃদ্ধিরই পরিচায়ক; তার ততটা শক্তি নেই মানুষ যতটা ধারণা করে।

তাদের দুর্বলতার প্রধান উৎস এই যে, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য পায় না, তাদের জাতির পক্ষ থেকেও কোনো সাহায্য পায় না। জালিম এমন কর্মকাণ্ড করে যা আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য হারাম করেছেন এবং বান্দাদের জন্যও হারাম করেছেন। একটি হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا؛ فلا تظالموا.

"হে আমার বান্দারা, আমি নিজের জন্য জুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা একে অপরকে জুলুম করো না।"[১৫৫]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার সঙ্গে জালিমের সম্পর্ক কিছুতেই স্থাপিত হতে পারে না। একইভাবে সে তার জাতির পক্ষ থেকেও কোনো শক্তি পায় না। কেননা, সে নিজেকে তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছে। ফলে তারা তাকে সহায়তা করে না, তার শাসনের জন্য সাহায্য করে না। বরং প্রত্যেক মানুষ তার পতন ও ধ্বংসের অপেক্ষায় থাকে।

এটাই বাস্তবিকতা, আল্লাহর কসম...নিশ্চয় জালিম অত্যন্ত দুর্বল!!

যেদিনই তিউনিসীয় জাতি এই সরল সত্য অনুধাবন করেছে স্বৈরাচারীর পতন ঘটেছে।

তিউনিসীয় জাতির উদ্দেশে যাইনুল আবেদিন বিন আলির সর্বশেষ ভাষণটি লক্ষ করুন! তাঁর কথাগুলো লক্ষ করুন, তিনি অপমানবোধ ও ঘৃণার সঙ্গে বলছেন, 'হ্যাঁ, আমি অবশেষে আপনাদের বুঝতে পেরেছি।' সম্পূর্ণ নির্বোধের প্রলাপ! তিনি দীর্ঘ তেইশ বছর জুলুম-উৎপীড়ন ও স্বৈরাচারী শাসনের পর তাদের বুঝতে পেরেছেন...

---

[১৫৫] সহিহ মুসলিম, কিতাব : আল-বিররু ওয়াস সিলাহ ওয়াল আদাব, বাব : তাহরিমুয যুলম, হাদিস নং ২৫৭৭; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২১৪৫৮; বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৪৯০; ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬১৯; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদিস নং ৭০৮৮; আস-সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১১২৮৩।

এখন তাদের বুঝতে পেরেছেন!

এই পয়েন্টের শুরুতেই আমি উল্লেখ করেছি যে, জালিম শাসন সম্পূর্ণরূপে ভঙ্গুর..

বিপ্লবের কাহিনির শুরুতে যে-যুবকটি জুলুমের শিকার হয়েছে সে যদি ন্যায়পরায়ণ ও ইনসাফপূর্ণ শাসনব্যবস্থা পেত, যা তার অধিকারের সুরক্ষা দেয়, তাহলে বিপ্লবের ঘটনা ঘটত না। এমন ঘটনা যদি কোনো সুশাসিত দেশে ঘটত, যেখানে জাতি ও সংবিধানের প্রতি যথাযথ সম্মান বজায় রাখা হয়, তাহলে অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে এই সমস্যার সমাধান হতো এবং ঘটনার ফলাফল তার জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু এই অন্ধকারাচ্ছন্ন উৎপীড়নমূলক শাসন বিস্ময়কর অপরিকল্পিত পরিণামের জন্ম দিয়েছে। জালিম তার মূল্য পরিশোধ করেছে; জুলুম ও নিপীড়নে যারা তাকে সায় দিয়েছে তাদেরও মূল্য পরিশোধ করতে হয়েছে।

তিউনিসিয়ার বিপ্লবের সবচেয়ে শিক্ষণীয় ব্যাপার এটিই...আরব জাতিগুলোর তা যথাযথভাবে অনুধাবন করা উচিত...হে আরব জাতি, তোমরা জুলুম ও অন্যায় দূরীকরণে সক্ষম! হে আরব জাতি, তোমাদের স্বৈরাচারীরা দুর্বল...হে আরব জাতি, তোমরা এমন কোনো 'বস্তু' নও যাকে কল্পিত নেতা নাড়িয়ে দিতে পারে এবং কোনো 'উত্তরাধিকার' নও যা পিতা থেকে পুত্র লাভ করে...তোমরা তেমন কিছু নও। তোমরা তোমাদের ধারণার চেয়েও বেশি শক্তিশালী। তোমাদের প্রতি জালিমরা যা ধারণা করে তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই তা জানে না।

তোমরা যেদিন এই সত্য ও বাস্তবিকতা অনুধাবন করতে পারবে—যেভাবে অভিজাত তিউনিসীয় জাতি তা অনুধাবন করেছে—সেদিনই মুক্তি মিলবে। উম্মাহ তার উপযুক্ত অবস্থানে ফিরে যাবে।

তৃতীয় পয়েন্ট :

তিউনিসিয়ায় যে-পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা আমাদের সামনে আল্লাহ তাআলার পরিবর্তনের যেসব নীতি রয়েছে তার একটিকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছে। তা এই যে, "পরিবর্তন এমনভাবে আসে যা আমরা ধারণাও করতে পারি না।"...

এটাই অতীতকালের নীতি...

যারা ইতিহাসের উত্থান-পতনের বাঁকগুলো ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছে তারা এ-ব্যাপারটিকে স্পষ্টভাবে বুঝেছে...

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরিতের নানা শিক্ষণীয় বিষয় লিখতে গিয়ে অনেক আগে আমি মক্কা বিজয় সম্পর্কে একটি দিক উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ, যেকোনো মানুষ মক্কা বিজয়ের সম্ভাবনা দেখতে পেত সে এর এক হাজারটি পদ্ধতি ও দৃশ্য নির্মাণ করতে পারত। কিন্তু যে-পন্থায় মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়েছে তা থাকত এক হাজার এক নম্বরে! কারণ, এভাবে মক্কা বিজয় হবে বলে কেউ কখনো কল্পনা করতে পারেনি!!

তিউনিসিয়ার রাজনীতির পর্যবেক্ষণচৌকিগুলো ও দেশটির ক্ষমতাসীন সরকার আগের বছরগুলোতে বরং আগের মাসগুলোতে কি কল্পনা করতে পেরেছিল এখানে এমনসব ঘটনা ঘটবে এবং তার পরিণতি হবে এরূপ?!

বরং যারা টেলিভিশনের স্ক্রিনে শুরুর দিনগুলো থেকে নিয়ে শেষের দিনগুলোর প্রতিবাদ-বিক্ষোভের ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করেছেন তারাও কি দূর কল্পনাতেও এমন পরিবর্তন ভাবতে পেরেছিলেন? তিউনিসিয়ার সড়কগুলোতে যখন প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চলছে তখন আমি ফ্রান্সে ভ্রমণে ছিলাম। ওখানে অনেক তিউনিসীয় নাগরিকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাদের মধ্যে ইসলামি আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী ও জাতীয় পর্যায়ের নেতাও রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশকেই আমি আশাবাদী দেখিনি। তাঁরা এসব বিপ্লবাত্মক ঘটনার পেছনে কোনো প্রত্যাশার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাননি। বরং তারা জুলুমের কিছুটা হলেও অবসান অথবা স্বাধীনতার কিছুটা আস্বাদ আশা করেননি!

এটা কি (রাজনৈতিক) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ত্রুটি? অথবা সঠিক রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অনুপস্থিতি?

না..; বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত..

এই ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়... তা আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত একটি নীতি!

﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلًا﴾

"তুমি কখনো আল্লাহর বিধানের কোনো পরিবর্তন পাবে না এবং কখনো আল্লাহর বিধানের কোনো ব্যতিক্রম দেখবে না।"[১৫৬]

প্রকৃত পরিবর্তন সব সময় এমনভাবে আসে যে আমরা তা কল্পনা করতে পারি না।

আল্লাহ তাআলা কেন তাঁর সৃষ্টিজগতে এই নীতি নির্ধারণ করেছেন?!

এর পেছনে কয়েকটি হেকমত ও প্রজ্ঞা রয়েছে। তার অধিকাংশই আমরা জানি না। কিন্তু দুটি হেকমত ও প্রজ্ঞা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে..

তার প্রথমটি এই যে, যাতে কেউ সাহায্য ও বিজয়ের ব্যাপারটি নিজের দিকে সম্পৃক্ত না করে; বরং আমরা যেন সব সময় তা আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করি। যদি মানুষের কিছু নির্দিষ্ট ধারণা ও অনুমানের ফলরূপে পরিবর্তন সূচিত হতো তাহলে তারা ভাবত তারা নিজেদের শক্তিবলেই এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে, এতে আল্লাহ তাআলার কোনো হাত নেই। এ-কারণেই আল্লাহ তাআলা পরিবর্তন নিয়ে আসেন এমন পন্থায় যা অনুমান করা যায়, কল্পনাও করা যায় না। যাতে আপনি আপনার অন্তর থেকে বলতে বাধ্য হন : সুবহানাল্লাহ, এমন ঘটনা ঘটল যা আমরা ধারণা করতে পারিনি... অবশ্য তা পরিবর্তন আনার জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত না-করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা নয়; আমরা বরং আমাদের যাবতীয় উপকরণ নিয়ে তৈরি থাকব এবং জানব যে, আল্লাহ তাআলা অবশেষে মানুষের অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন করে দেন যা আমরা ভাবতেও পারি না।

দ্বিতীয় প্রজ্ঞা এই যে, মানুষের মধ্যে আশাবাদ ও প্রত্যাশার চিরাচরিত অবস্থা সুরক্ষিত রাখা। আল্লাহ তাআলার এই নীতি যদি না থাকত তাহলে এই অন্ধকারাচ্ছান্ন নষ্ট যুগসমূহে হতাশা মানুষকে গ্রাস করে ফেলত। কিন্তু (পরিবর্তনের) এই নীতি থাকার ফলে মানুষের হৃদয়ে সর্বদা আশার আলো ও প্রত্যাশার জাগরণ থাকে। আসন্ন যেকোনো মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটতে পারে; এবং তা ঘটে এমন পন্থায় যা প্রথাগত বা প্রচলিত নয়। এই নতুন আশা ও নবপ্রত্যাশা মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং কর্মের ফলে আল্লাহর

---

[১৫৬] সুরা ফাতির : আয়াত ৪৩।

সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এ-কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর অলৌকিক পন্থায় পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। আমি এটাই বুঝেছি আল্লাহ তাআলার এই বাণী থেকে—

﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

"এবং আল্লাহ তাআলা কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"[১৫৭]

আল্লাহ তাআলাই পরিবর্তন ঘটান। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটান না যতক্ষণ মানুষ পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে না, উঠে-পড়ে লাগে না। হাতাশাগ্রস্ত লোকেরা জেগে উঠতে পারে না, প্রচেষ্টা ব্যয় করতে পারে না। দশকের পর দশক ধরে জালিমদের শাসনক্ষমতার উত্তরাধিকার প্রাপ্তি মানুষের মধ্যে এমন হতাশা তৈরি করে। যদি আল্লাহ তাআলার এই নীতির অস্তিত্ব না থাকত যা মানুষের অন্তরে প্রত্যাশাকে জ্বালিয়ে রাখে, তাহলে একদিন সবকিছু নষ্টভ্রষ্ট জালিমদের দখলে চলে যেত...তা কীভাবে? জানি না, কিন্তু তা অবশ্যই ঘটত।

আমি আমার এই বক্তব্য সকল আরব ও মুসলিম জাতিকে শোনাতে চাই। তারা একই জুলুম-উৎপীড়ন-দুর্দশার ভুক্তভোগী যার ভুক্তভোগী ছিল তিউনিসীয় জাতি..

আপনারা আপনাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করুন। জেনে রাখুন, জালিমেরা দুর্বল এবং পরিবর্তন অবশ্যই আসবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনারা যে দেখছেন সকল পথই তো বন্ধ—এই কারণে আপনারা দুঃখিত হবেন না; বরং এখানে বিশাল প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত রয়েছে যা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না। আপনারা তা কিছুতেই দেখতে পাবেন না যতক্ষণ না আল্লাহ তা আপন কুদরতের দ্বারা উন্মুক্ত করে দেন। আল্লাহ কখন তা উন্মুক্ত করবেন? তিনি যখন দেখবেন, আপনারা যে-সকল পথ বন্ধ দেখছেন সেগুলোকে উন্মুক্ত করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করছেন...সে-সময় তিনি আপনাদের জন্য তাঁর রহমতের এমন পথ উন্মুক্ত করে দেবেন যা আপনারা কল্পনাও করতে

---

[১৫৭] সুরা রা'দ : আয়াত ১১।

Contents

পারেননি, যে-পথ উন্মুক্ত করার জন্য আপনারা চেষ্টাও করেননি...এটাই অতীতের নীতি, এর কোনো ব্যতিক্রম নেই...সুতরাং আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং চেষ্টায় লেগে পড়ুন।

চতুর্থ পয়েন্ট :

সম্ভবত সবাই যাইনুল আবেদিন বিন আলির পলায়নের পর প্রায় ৪৮ ঘণ্টাব্যাপী আরব নেতাদের সম্মিলিত মৌনতা অবলম্বন প্রত্যক্ষ করেছেন। অধিকাংশ আরব নেতার কাছ থেকে এই দুই দিনের মধ্যে আমরা কোনো মন্তব্য শুনিনি। পরে তারা যে-মন্তব্য করেছেন তা একই ধরনের। কিন্তু দেরি করার রহস্য কী?

সত্য এই যে, তাঁদের মন্তব্য করতে বিলম্ব করার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে...প্রথমত, তিউনিসিয়ার বিপ্লব আরব নেতাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক ছিল। কারণ, যাইনুল আবেদিন বিন আলি স্বৈরাচারের দোসর ও একনায়কতন্ত্রের বান্ধব। তাঁর শাসনপদ্ধতি অধিকাংশ আরব নেতার শাসনপদ্ধতি থেকে ততটা ভিন্ন নয়। সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আরব বিশ্বের সকল নেতাই অকস্মাৎ দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। প্রত্যেকেই নিজেকে যাইনুল আবেদিন বিন আলির জায়গায় কল্পনা করছিলেন। এই অবস্থায় প্রত্যেকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কোনো সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়ত, সবাই আমেরিকা ও ফ্রান্সের মতামতের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কারণ, অধিকাংশ আরব নেতা তাঁদের সিদ্ধান্তগুলো যে আমেরিকার স্বার্থের/প্রবণতার পরিপন্থী হবে না এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর তিউনিসিয়ার ক্ষেত্রে একইভাবে ফ্রান্স কী সিদ্ধান্ত নেয় তারও অপেক্ষায় থাকতে হয়। অন্যথায় প্রত্যেক নেতাই অনুশোচনায় ভুগবেন যে, তিনি এই ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন এবং বারাক ওবামা[১৫৮] বা নিকোলা সারকোজি[১৫৯]র মতামতের অপেক্ষা করা ছাড়াই তিনি মত দিলেন।

---

[১৫৮] আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট।

[১৫৯] ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক নেতাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাই অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। যাতে তিউনিসিয়ার অগ্নিস্ফুলিঙ্গে তাঁর নিজের দেশে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে না ওঠে। যাইনুল আবেদিন জাহান্নামে যাক, কিন্তু আমি প্রাণে বাঁচি...প্রাণে বাঁচি, আমার সিংহাসন...আমার সিংহাসন। দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরই আমরা তিউনিসিয়ার ঘটনায় আমাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য ব্যক্ত করব।

চতুর্থত, আরব নেতারা আমরা দুই নম্বর পয়েন্টে যা বলেছি তা বুঝতে পারেননি। অর্থাৎ, জুলুম একটি ভঙ্গুর শাসনব্যবস্থা তৈরি করে। ফলে তাঁরা তাঁদের জাতির জনমণ্ডলীর সঙ্গে সদ্ভাব তৈরি বা সামান্য স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য মনোযোগী হননি; বরং তাঁরা বিপরীত দিকে মনোযোগী হয়েছেন! নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কীভাবে আরও সুসংহত করা যায় সেদিকে মনোনিবেশ করেছেন। তাঁরা ভেবেছেন, যা যাইনুল আবেদিন বিন আলিকে ধ্বংস করেছে তা হলো গোটা দেশে নিরাপত্তা-ব্যবস্থা জোরদার না-করা। ফলে আরব দেশগুলোতে (তাদের নেতাদের নির্দেশে) নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যরা কিলবিল করে ছড়িয়ে পড়ে এবং ওত পেতে থাকা ও নিরাপত্তাবলয় নির্মাণের ঘটনা বেড়ে যায়। এসবকিছুর জন্য চেষ্টা ও সময়ের প্রয়োজন ছিল। তারপর তারা তিউনিসিয়ার ঘটনার ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন।

এতসব অপেক্ষার পরে তাঁরা যে-বিবৃতি দিয়েছেন ও মন্তব্য করেছেন তা চূড়ান্ত হাস্যকর!!

তাঁদের মন্তব্য ও বিবৃতি যে হাস্যকর তার কারণ দুটি..

প্রথমত, তাঁদের বিবৃতি ও মন্তব্যগুলো আমেরিকা ও ফ্রান্সের বিবৃতি ও মন্তব্যের অনুরূপ, যেন তা আশ্চর্যজনক কাকতালীয় ঘটনা!!

দ্বিতীয় হাস্যকর ব্যাপার হলো স্বয়ং তাঁদের মন্তব্য ও বিবৃতি...নেতাগণ বলেছেন, "আমরা তিউনিসীয় জাতির অভিপ্রায়কে সম্মান জানাই।"

তাদের এই পুরোনো কৌতুকে অট্টহাস্য করা ছাড়া উপায় নেই।

আরব নেতারা—যাঁদের অধিকাংশই তাঁদের জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান দেন না—তাঁরা তিউনিসীয় জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান দিচ্ছেন!!

প্রত্যেক নেতারই মাউথপিস বলছিল : "আমি দুনিয়ার সকল জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান দিই, কেবল আমার জাতি ব্যতীত।"

যেন এ-সকল নেতা তাঁদের দেশে নির্বাচন-জালিয়াতি ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ব্যাপারগুলো দেখতে পাননি। তাঁরা হাজার হাজার কারাবন্দি দেখতে পাননি। দেখতে পাননি শতশত যুবককে কারাগারে নির্মম নির্যাতনের পেষণযন্ত্রে তিলে তিলে হত্যা করা হচ্ছে। ক্ষুধার্তদের তাঁরা দেখতে পাননি। দুর্নীতি, আত্মসাৎ, ঘুষ ও দালালির রমরমা অবস্থাও তাঁরা দেখতে পাননি।

সত্যি সত্যিই হাস্যকর ব্যাপার!

তাঁদের প্রচারসংস্থার কাণ্ডকারখানাও হাস্যকর।

আরবের রাষ্ট্রীয় প্রচারসংস্থাগুলো তিউনিসিয়া জালিম অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে সংবাদ ও আলোচনা প্রচার করতে থাকে। তারা তিউনিসিয়ার হাল-হাকিকত নিয়ে কথা বলতে থাকে, যেন ওই দেশের অবস্থা তাদের কাছে একেবারেই নতুন ও অভিনব। তারা তিউনিসীয় জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও সাহসী জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করে যারা স্বৈরাচারী অন্যায়-জুলুম মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। অথচ এসব প্রচারসংস্থাই কয়েক মাস আগে ও যাইনুল আবেদিন বিন আলির যেকোনো আরব দেশ সফরের সময় তাঁর শাসনামলে তিউনিসিয়ার জাগরণ ও উন্নয়ন নিয়ে পঞ্চমুখে কথা বলত এবং দেশটি অগ্রগতি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি ও খেলাধুলায় কী বিপুল উন্নতি করেছে তা প্রচার করত।

তারা মিথ্যাচারী, সম্পূর্ণ মিথ্যাচারী!

তারা ইতিপূর্বে সাদ্দাম হোসাইনের ব্যাপারে একইরকম কথা বলেছে; কিন্তু তাঁকে (ফাঁসিতে ঝুলিয়ে) হত্যা করার পরে তাঁকে জবাই করে ছেড়েছে..

জাফর নামিরি[১৬০]র ব্যাপারেও এভাবে কথা বলেছে; কিন্তু তিনি পদচ্যুত হওয়ার পর তাঁকে চাবুকপেটা করেছে..

এখন তারা স্বৈরাচারী যাইনুল আবেদিন বিন আলির ব্যাপারেও অনুরূপ কথা বলছে। তিনি পুরো তেইশ বছর দেশের ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে

---

[১৬০] জাফর মুহাম্মদ নামিরি, সুদানের প্রেসিডেন্ট (১৯৬৯-১৯৮৫)

থেকেছেন। অন্যান্য আরব নেতার তুলনায় এই তেইশ বছর যেন অনেক বেশি। অথচ সত্য এই যে, আরব নেতাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কম সময় ক্ষমতায় ছিলেন!

এসব সরকারি প্রচারসংস্থাগুলো ক্ষমতার সিংহাসনচ্যুত নেতাকে নিয়ে একই পন্থায় কথা বলে। যেন তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘোরপাক খায়...তাদের কোনো চরিত্র নেই, কোনো ধর্ম নেই...তাদের কাছে কিছু আমানত নেই, তাদের বিবেক বলে কিছু নেই।

পঞ্চম পয়েন্ট :

বস্তুবাদী সংস্থাগুলো খুব সহজেই পরস্পরকে বিকিয়ে দেয়!

তাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বন্ধুত্ব নেই। তারা পরস্পরকে ভালোও বাসে না। তাদের কেউ অন্যদের প্রজ্ঞায় বা সদিচ্ছায় সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত নয়..; বরং স্বার্থচিন্তা ও প্রবৃত্তিই তাদের পরিচালিত করে..

এই যে যাইনুল আবেদিন বিন আলি তিনিও তাঁর সহায়ক সাঙ্গপাঙ্গদের বেঁচে দিয়েছেন এবং তাঁর পরিবারকে নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি তাঁর পরিবারকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদেরও বিক্রি করে দেননি! তিনি তাঁরা দোসরদের দেশেই ফেলে গিয়েছেন যাতে তারা তাদের পরিণাম ভোগ করতে পারে...তাদের কোনো ওজন নেই, কোনো মূল্যও নেই...নেতার সাঙ্গপাঙ্গদের গ্রেপ্তার চলতে থাকে অব্যাহতভাবে, যারা কিছুদিনের জন্য ছিল প্রশংসিত ও সম্মানার্হ...।

একইভাবে আরব দেশগুলোতে যাইনুল আবেদিন বিন আলির বান্ধবরাও তাঁকে বিকিয়ে দেয়। তারা ঘোষণা করে—যেমন ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, তারা তিউনিসীয় জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যাইনুল আবেদিনের পতন ঘটেছে, সুতরাং পাগুলে তাঁকে মাড়িয়েই যাবে...কিন্তু তিনি যদি তরুণদের বিপ্লব ভণ্ডুল করে দিতে সক্ষম হতেন তখন এসব নেতা বিপ্লবীদের 'দেশদ্রোহী' ও 'উচ্ছৃঙ্খল জনতা' বলে আখ্যায়িত করতেন এবং যাইনুল আবেদিনকে প্রতিভা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অভিনন্দন জানাতেন!!

হ্যাঁ, বন্ধু ফ্রান্সও যাইনুল আবেদিনকে বিকিয়ে দেয়...অথচ ফ্রান্স ছিল যাইনুল আবেদিনের মা-বাবার চেয়েও নিকটাত্মীয়। কিন্তু এটা হলো স্বার্থের দুনিয়া...এখানে মূল্যবোধ বা নৈতিকতার কোনো দাম নেই।

এটাই হলো প্রত্যেক নেতার এবং একইভাবে নেতাদের প্রত্যেক দোসরের জন্য বার্তা...একদিন তোমাকে সবাই বিকিয়ে দেবে!

তারা তোমাকে তোমার মাহাত্ম্যের কারণে ভালোবাসেনি, তোমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে তারা তোমার প্রতি মনোযোগী থাকেনি; বরং তারা তা করেছে তোমাদের যে-চাবুক ছিল তার কারণে। তোমার হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলে তাদের পা তোমাকে মাড়িয়ে যাবে..সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ করো!

ষষ্ঠ পয়েন্ট :

আমরা যে তিউনিসিয়ায় জাতির সম্মিলিত বিদ্রোহ ও বিপ্লব দেখলাম, যার ফলে স্বৈরাচারী শাসক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে লাঞ্ছিত ভঙ্গিতে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, এর পেছনে রহস্য কী?! তাঁরা বলছেন, তিউনিসিয়ার জনমণ্ডলী চরম বেকারত্বের শিকার হয়ে পড়েছিল। দারিদ্র্য ও ক্ষুধার নিগড়তলে যন্ত্রণাকাতর ও দুর্বল ছিল। একইভাবে মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি তিউনিসীয় জাতিকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। তাই অকস্মাৎ এই সম্মিলিত বিপ্লব...

তিউনিসীয় জাতির বিপ্লবের রহস্য উন্মোচনে কতিপয় ব্যাখ্যা

কিন্তু আমি—বাস্তবিক বিবেচনায় অপেক্ষাকৃত ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো দেখতে চাই।

কোনো সন্দেহ নেই যে, বেকারত্ব, ক্ষুধা ও দুর্নীতি তিউনিসিয়ার জনমণ্ডলীকে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকার পর ফুঁসে উঠতে বাধ্য করেছে..কিন্তু আমার বিবেচনায় এসব বিষয়ই তিউনিসিয়ার ঘটনাবলির জন্য প্রধান অনুঘটক নয়। তা দুটি কারণে :

প্রথম কারণ : তিউনিসিয়ায় দরিদ্রতার অবস্থা মারাত্মক পর্যায়ের নয়। প্রত্যেকটি বিষয়ই আপেক্ষিক...উপসাগরীয় দেশগুলোর তুলনায় তিউনিসিয়ার অবস্থা দারিদ্র্যপূর্ণ; কিন্তু দেশটি ইয়ামান, সুদান ও আফ্রিকার সাধারণ রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় অনেক ধনী। তিউনিসিয়ার যুবকদের সামনে ইউরোপ ও কানাডায় যাওয়ার

Contents

পথও উন্মুক্ত। তা ছাড়া দেশটিতে বৈষয়িক অবস্থা এতটা দুর্দশাপূর্ণ ছিল না যে তা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর হিংস্র সদস্যদের সামনে বেরিয়ে পড়তে প্ররোচিত করে। এটা তো সবাই জানেন।

দ্বিতীয় কারণ : তিউনিসিয়ায় যে-অবস্থা ছিল তার চেয়ে অনেক করুণ ও বিপর্যয়কর অবস্থা ছিল অধিকাংশ আরব দেশে। তিউনিসিয়ায় দুর্নীতি—বেশি হওয়া সত্ত্বেও অনেক আরব রাষ্ট্রের দুর্নীতির চেয়ে কম। আপনারা আমার সঙ্গে নিম্নবর্ণিত জরিপের ফলাফল পড়ুন..।

২০০৯ সালে ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্ট বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর দুর্নীতির আনুপাতিক হার বর্ণনা করেছে। আর ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্ট আপনারা জানেন—প্রশাসন, অর্থব্যবস্থা ও নির্বাচনে কী পরিমাণ দুর্নীতি ঘটেছে তার ওপর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়। ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্ট দশের মধ্যে মার্ক দিয়ে থাকে। যে-রাষ্ট্র দশের মধ্যে দশ পায় সেই রাষ্ট্রে কোনো দুর্নীতি নেই। দুর্নীতির মাত্রার আনুপাতিক হারে এই মার্ক কমতে থাকে। উদাহরণত, যে-রাষ্ট্র দশের মধ্যে সাত মার্ক পায়, তার অর্থ এই যে, সেখানে প্রতি দশ লেনদেন বা কার্যক্রমের তিনটির মধ্যেই দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে। বাকি সাতটি লেনদেন বা কার্যক্রম দুর্নীতিমুক্ত ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্টে তিউনিসিয়ার অবস্থান কী

২০০৯ সালের ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্টে তিউনিসিয়া ৪.২ মার্ক পেয়েছে। অর্থাৎ, দেশটি প্রচুর পরিমাণে দুর্নীতি রয়েছে। দেশটির অভ্যন্তরে প্রতি দশ লেনদেন বা কার্যক্রমের মাত্র ৪.২ টি দুর্নীতিমুক্ত ও সততাপূর্ণ। বাকিগুলো দুর্নীতি-আক্রান্ত।

দুর্নীতির এই মাত্রা অত্যন্ত খারাপ, এতে কোনো সন্দেহ নেই..।

কিন্তু অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের অবস্থা কী?

কুয়েতের অর্জিত মার্ক ৪.১; মাগরিবের (মরক্কো অঞ্চলের) ৩.৩; আলজেরিয়ার ২.৮; মিসরের ২.৮; সিরিয়ার ২.৬; লেবাননের ২.৫; লিবিয়ার ২.৫; ইয়ামানের ২.১..

প্রশ্ন এই যে, যদি (তিউনিসিয়ার বিপ্লবের পেছনে) দুর্নীতিই মৌলিক কার্যকারণ হয়ে থাকে তাহলে এসব দেশে কোনো বিপ্লব সংঘটিত হলো না?!

তিউনিসিয়ায় যে-বেকারত্ব তাও আরব বিশ্বের অন্য রাষ্ট্রগুলোর বেকারত্বের অনুরূপ। তিউনিসিয়ায় বেকারত্বের হার ১৪.১%; এটা বেকারত্বের উচ্চমাত্রা, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু তিউনিসিয়ার আশপাশের দেশগুলোর বেকারত্বের কী অবস্থা?

মৌরিতানিয়ায় বেকারত্বের হার ৩৩.২%; ইয়ামানে বেকারত্বের হার ১৮.৪%; লিবিয়ায় বেকারত্বের হার ১৮.১%; সুদানে বেকারত্বের হার ১৭.৩%; লেবাননে বেকারত্বের হার ১৫%; এসব দেশের বেকারত্বের হার তিউনিসিয়ার চেয়ে বেশি।

অন্য রাষ্ট্রগুলোতেও বেকারত্বের হার তিউনিসিয়ার কাছাকাছি। আলজেরিয়ায় বেকারত্বের হার ১৩.৮%; জর্ডানে বেকারত্বের হার ১২.৭%; মাগরিবে (মরক্কোয়) বেকারত্বের হার ৯.৬%; মিসরে বেকারত্বের হার ৯% এবং সিরিয়ায় বেকারত্বের হার ৮.৪%।

বিবেচনায় নিলে, এসব দেশে ছদ্ম বেকারত্বের হার অনেক বেশি। কারণ, বহু জনগোষ্ঠী চূড়ান্ত নিম্ন বেতন-ভাতায় 'কাজ' করে। তারা এক ধরনের বেকার। তাদের যে-বেতন দেওয়া হয় তা ইউরোপ বা আমেরিকায় বেকারদের যে-বেকারত্বভাতা দেওয়া হয় তার চেয়ে অনেক কম!

বিবেচনায় নিলে, বেকার নাগরিকদের সংখ্যাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদাহরণত, মিসরের দিকে তাকালে দেখব যে ওখানে বেকারত্বের হার ৯%, যা ২ মিলিয়নেরও বেশি (২,১৮৮,০০০) বেকার নাগরিকের সমান!

আমরা যদি মনে করি যে, তিউনিসিয়ায় বিপ্লবের প্রধান কারণ ছিল বেকারত্ব তাহলে অন্যান্য দেশে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল

আরও বেশি। আপনি ভাবতে পারেন যে, কেবল মিসরে বেকার জনগোষ্ঠী একটি বিপ্লব ঘটাতে পারে, যেখানে বিপ্লবীদের সংখ্যা দাঁড়াবে দুই মিলিয়নেরও বেশি! যদি তাদের সঙ্গে তাদের পরিবারও বেরিয়ে আসে তাহলে তারা প্রায় দশ মিলিয়ন বিপ্লবীতে পরিণত হবে! এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের ভীতিজনক একটি সংখ্যা। তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কোনো সরকারের নেই, যে-কেউ শাসক হোক না কেন..

কিন্তু বড় সমস্যা মূলত বেকারত্ব নয়, যদিও তা একটি প্রভাবক কার্যকারণ..

তাহলে, সমস্যা কোথায়?

আমরা এখনো পর্যন্ত যে-সাফল্য দেখতে পাচ্ছি তার রহস্য কী?

বাস্তবিকতা, আমি যা মনে করি তা এই যে, আরব বিশ্বের সরকারগুলোর মধ্যে তিউনিসিয়ার সরকার মানুষের মর্যাদা ও সম্ভ্রমকে সবচেয়ে বেশি ভূলুণ্ঠিত করেছে। এই সরকার জনমণ্ডলীর স্বাধীনতাকে সবচেয়ে বেশি শৃঙ্খলিত করেছে। মানুষকে সবচেয়ে বেশি বোবা বানিয়ে রেখেছে। এসব বিষয়ই তিউনিসিয়ার জনমণ্ডলীকে বিপ্লবের পথে উত্তেজিত করেছে। প্রাচীনকালে আরবরা বলত :

"স্বাধীন নারী ক্ষুধার্ত হয়; কিন্তু নিজের স্তন ভাড়া দিয়ে খায় না।"[১৬১]

প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণমূলক শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিলেন যাইনুল আবেদিন বিন আলি, তাঁর আগে চাপিয়ে দিয়েছিলেন হাবিব বুরগিবা। এমন শাসনব্যবস্থা তীব্র প্রতিবন্ধকতামূলক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থারই অনিবার্য বিস্ফোরণ ঘটে বিপ্লবের আকারে। আমি আমার ওয়েবসাইট "قصة الاسلام/ www.islamstory.com"- এ ২০০৯ সালের ১লা অক্টোবর في مصير الحجاب تونس !! (তিউনিসিয়ায় হিজাবের পরিণতি) শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশ করেছিলাম। তাতে আমি বলেছিলাম :

---

[১৬১] প্রবাদ : تَجُوعُ الحُرَّةُ وَلاَ تَأكُلُ بِثَدْيَيْهَا অর্থাৎ, لا تكون ظِئْراً وإنْ آذاها الجوع। অর্থাৎ, ক্ষুধায় আক্রান্ত হলে অন্যের শিশুকে স্তন ভাড়া দেয় না। কেউ নিকৃষ্ট পন্থায় সম্পদ উপার্জন করলে এই প্রবাদবাক্য বলা হয়। এই প্রবাদের একটি চমৎকার গল্প আছে।

إن هذا الضغط المستمر على الشعب لن يوفِّر لكم الأمان أبدًا، ولن يثبِّت أقدامكم أمام عدوكم، ولن يحفظكم -كما تريدون- في كراسيكم.. إن هذا الخصام بين الشعب وحُكّامه سيقود الشعب حتمًا إلى ثورة، وسيأتي زمن يفيض الكيل بالناس فينقلبون على من يخنقونهم ويذلونهم، وقد لا تكون هذه الثورة منضبطة، وقد تخرج عن حدود المألوف والمعقول.

"জাতির ওপর নিরবচ্ছিন্ন কঠোর নিয়ন্ত্রণ আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে না এবং শত্রুদের সামনে আপনাদের দৃঢ়পদ রাখবে না। ক্ষমতার সিংহাসনের ওপর আপনারা যেমন চান—আপনাদের সুরক্ষা দেবে না..। জাতি ও তার শাসকদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব-লড়াই অনিবার্যভাবে জাতিকে বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেবে। এমন এক সময় আসবে যখন দেশে জন-জোয়ারের সৃষ্টি হবে; জনতা যারা তাদের দাবিয়ে রাখছে ও তাদের অপদস্থ করছে তাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এই বিপ্লব হবে উচ্ছ্বসিত ও বিশৃঙ্খল এবং প্রথাগত ও চিন্তার গণ্ডির মধ্যে থাকবে না।"

যাইনুল আবেদিন বিন আলি ও হাবিব বুরগিবার সরকারের অনমনীয় স্বেচ্ছাচারিতা সকল প্রচারমাধ্যমের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, সবধরনের বিরোধী দলকে অকেজো করা, গ্রেপ্তার, কারাগার, নির্যাতন, বিতাড়ন, নির্বাসন ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তাঁরা এসব ছাড়িয়ে গিয়ে উম্মাহর ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৃঢ়তার ওপর আঘাত হেনেছেন...।

একটি দেশের ৯৮% মানুষ মুসলমান, অথচ দেশটির শাসক নারীর হিজাবকে সাম্প্রদায়িক পোশাক আখ্যায়িত করছে, হিজাব পরিহিতা নারীদের (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্র থেকে) বিতাড়িত করছে, এসব অন্যায়কে বৈধতা দিয়ে আইন ও প্রজ্ঞাপন জারি করছে এবং তা মানুষের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। আপনি যখন এসব ব্যাপার দেখবেন, আপনার তা ভালো লাগবে না।

আমরা দেখছি যে, অধিকাংশ আরব নেতা ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে জটিলতা ও সংকট সৃষ্টি করছে। কিন্তু তারা প্রকাশ্য পন্থায় 'ইসলামের হুকুম-আহকামকে ইতর ও নিকৃষ্ট' আখ্যাদানের মতো অপরাধে লিপ্ত

হয়নি। তারা জনমণ্ডলীকে বোবা বানিয়ে রেখেছে বটে, কিন্তু কিছু মুখকে কথা বলার অনুমতি দিয়েছে, যাতে এ-মুখগুলো অবরুদ্ধ অবস্থার 'একটি উন্মুক্ত পর্যায়'-এর কথা বলতে পারে। তাই এখানে জনতার বিস্ফোরণ ঘটেনি। সরকার-বিরোধী প্রচারমাধ্যমকেও তারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা দিয়েছে, যাতে সেগুলো মানুষের সংকট ও সমস্যা নিয়ে কথা বলে। এতে মানুষ স্বস্তি বোধ করবে এবং ভাববে যে, সকল সমস্যার সমাধান যেন হয়ে গেছে..

এটা অন্য স্বৈরাচারীদের রাজনৈতিক মেধা; কিন্তু যাইনুল আবেদিন বিন আলি তাঁর রাজনৈতিক মেধাকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারেননি। ফলে যে-পরিণতি ঘটেছে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

সাধারণভাবে এটাই সকল নেতার কাছে বার্তা...এই রাজনৈতিক মেধা ক্ষমতার মসনদে তোমাদের আয়ুকে দীর্ঘ করবে বটে; কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। একদিন মানুষের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করা ও স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করার সীমা একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না, তখনই জাতি বিদ্রোহ করবে এবং তিউনিসিয়ায় যা ঘটেছে তা-ই ঘটবে।

সপ্তম পয়েন্ট :

আমেরিকা ও ফ্রান্স এই বিপ্লবের প্রতি সম্মতি জানিয়েছে, যাতে তা অব্যাহত থাকে ও সফল হয়। কেন? তারা কোনো যাইনুল আবেদিনকে এতটা সহজে বিকিয়ে দিল? যাইনুল আবেদিন কি তাদের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করেছিলেন? তিনি নির্ধারিত সীমারেখা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন?

কখনো নয়...তিনি নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করেননি! আমেরিকা ও ফ্রান্সের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা থেকে তিনি অতিশয় পবিত্র!

বাস্তাবিক ব্যাপার হলো, তিনি বাতিল কাগজে পরিণত হয়েছিলেন!

তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছিল ৭৪ বছর। আমি জানি যে, তিনি এই বয়সেও তাঁর সহকর্মীদের তুলনায় নিজেকে তরুণ ভাবতেন! কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যগত অবস্থা দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁকে যথাযথভাবে দেশ পরিচালনার সুযোগ দিচ্ছিল না। কার্যত তাঁর স্ত্রী দেশটির প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ

করেছিলেন। এই পরিস্থিতি নিকটতম সময়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গড়বড় ঘটার ইঙ্গিত দিচ্ছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কিছুতেই পূর্বে নির্দেশনা মোতাবেক চলছিল না। এ-কারণে তিউনিসিয়ার অভ্যন্তরে সাংগঠনিক প্রবণতা বৃদ্ধি যায় এবং এর ফলে নিকট ভবিষ্যতে সিস্টেমেটিক ও নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এসব পরিবর্তন ছিল ইসলামপন্থার অনুকূলে অথবা নিদেনপক্ষে পরিচ্ছন্ন (দুর্নীতিমুক্ত)। ফলে ফ্রান্স ও আমেরিকার স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হচ্ছিল না।

সুতরাং এই বুড়োকে বিদায় করা হোক, সে এখন আর উপযুক্ত পর্যায়ে নেই। তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের আনা হোক যাদের সঙ্গে সহজে কাজ করা যাবে। অর্থাৎ, যাদেরকে পশ্চিমাদের কাছে সহজেই বিক্রি করা যাবে..

সেই স্বার্থ রক্ষার্থে (রাষ্ট্রের) দুর্বল নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় শক্তিশালী ইসলামি ভাবধারা বিকশিত হওয়ার পূর্বে এখনই পরিবর্তনের সূচনা হওয়া উচিত।

পরে অনুকূল ঘটনা ঘটে যায় এবং জাতির ক্রোধ ও বিক্ষোভের মাত্রা ক্রমাগত বাড়তে থাকে..

এতে (বিক্ষোভ ও বিপ্লবে) ফ্রান্সের নাক গলানোর সুযোগ ছিল...পুলিশের শত লোককে হত্যার মধ্য দিয়ে সহিংস পন্থায় অনুপ্রবেশের সুযোগ ছিল... সেনাবাহিনীর নাক গলানোর সুযোগ ছিল, যদিও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তারা ছিল অবাঞ্চিত। কিন্তু অধিকাংশ ব্যাপার আমেরিকা বা ফ্রান্সের সরকারি বা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে ঘটেছে। তারা দেশের অভ্যন্তরীণ প্রভাবশালী নেতৃত্বকে বিপ্লব ছড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে ইঙ্গিত দিয়েছে...তা এখন নেতৃত্বহীন...তারা চেয়েওছিল বিপ্লব নেতৃত্বহীন থাকুক। কারণ, তাদের ছক অনুযায়ী তাদের পক্ষ থেকে নেতা বানানো হবে..;বরং ওই নেতা হয়তো এখন থেকে নামে পরিচিত.. এবং তিনি দেশের নিরাপত্তা সংস্থা একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা...যাতে নেতা বানানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের পক্ষ থেকে একজন নেতা বানানোর জন্য এখানে প্রবেশ করবে, যেমন তারা ইতিপূর্বে বহু নেতা বানিয়েছে!

বিপ্লব চলতে থাকে এবং একে তার গন্তব্যের পথে চলতে দেওয়া হয়..

কে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে? আমরা জানি না! কিছুতেই জানব না! আমাদের জানা সঙ্গতও নয়!

মার্কিনরা ও ফরাসিরা ব্যতীত গোটা দুনিয়া বিস্মিত বোধ করে। তাদের মন্তব্য ও প্রতিক্রিয়া এসেছে অত্যন্ত ধীর গতিতে, অত্যন্ত প্রশান্তভাবে : আমার তিউনিসীয় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শ্রদ্ধা জানাই।

যে-ফ্রান্স ৭৫ বছর তিউনিসিয়া দখল করে রেখেছিল সেই ফ্রান্স তিউনিসীয় জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে শ্রদ্ধা জানায়!!

যে-আমেরিকা ইরাক ও আফগানিস্তান দখল করে রেখেছে এবং ফিলিস্তিনে যায়নবাদের সঞ্জীবনীর ভূমিকা পালন করছে সেই আমেরিকা জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে শ্রদ্ধা জানায়!!

কেউ কি তা বিশ্বাস করবে?!

নিকট ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক!

এই বিপ্লবের পর তিউনিসিয়ায় নেতৃত্বে যদি ইসলামপন্থীরা সফল হয়, তবে এ-ব্যাপারে কি আমেরিকা বা ফ্রান্স চুপ থাকবে?!

তোমার যা-কিছুর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কত দূরে, কত দূরে!

ফ্রান্স ১৯৯০ সালের আলজেরিয়ার নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। যদিও সকলে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারা জাতির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর পেছনে দাঁড়ায়।

আমেরিকা ২০০৬ সালের ফিলিস্তিনের নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, এই নির্বাচনে ইসলামি আন্দোলন হামাস বিজয়ী হয়। অথচ সবাই নির্বাচনের স্বচ্ছতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমেরিকা হামাসকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন বিবেচনা করে। ফলে তারা নির্বাচনে যারা পরাজিত হয় তাদের পাশে দাঁড়ায়। এভাবে ফিলিস্তিনিদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দিতে যারপরনাই চেষ্টা করে..

আমেরিকা একইভাবে মিসরকে ২০০৫ সালের নির্বাচনে খেল-তামাশা না করতে সতর্ক করে। তারপর প্রথম পর্বের নির্বাচনে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বহু সংখ্যক সদস্য মনোনীত হন। তার ফল দাঁড়ায় এই যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের নির্বাচনে আমেরিকা তার দৃষ্টি নুইয়ে রাখে, ভ্রূক্ষেপ করে না। অথচ এই দুই পর্বের নির্বাচনে নির্লজ্জ জালিয়াতি হয়, আমেরিকা

কোনো মন্তব্য করে না। মিসরের ২০১০ সালের নির্বাচনেও আমেরিকা কোনো মন্তব্য করা থেকে নিজেকে রেহায় দেয়। অর্থাৎ, যতক্ষণ নির্বাচনের ফলাফল হবে ইসলামপন্থীদের দমন-পীড়ন ততক্ষণ তারা চুপ থাকবে, যদিও প্রকাশ্যভাবে ও নির্লজ্জ পন্থায় জালিয়াতি ও কারচুপি হয়..

নিশ্চয় তারা মুমিনের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোনো মর্যাদা দেয় না!

এটা তাদের সমস্যা নয়...বরং তা মুসলমানদের সমস্যা, যারা তাদের ক্ষমতার লাগামকে মুসলিম ও অমুসলিম প্রবৃত্তিপূজারীদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং আমেরিকা বা ফ্রান্স অথবা অন্য কোনো পশ্চিমা রাষ্ট্রের দয়া-অনুকম্পার অপেক্ষায় থাকছে। তারা স্পষ্টভাবেই আশা করে আছে যে, তাদের দেশে পশ্চিমাদের পক্ষ থেকেই পরিবর্তনের সূচনা ঘটবে! কিন্তু অধিকারসমূহ—হে আমার ভাইয়েরা ও বোনেরা দেওয়া হয়, বরং তা নিতে হয়!

অষ্টম পয়েন্ট :

অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ব্যাপার!

কে ফল ভোগ করবে?

অন্যান্য আরব দেশে এমন বিপ্লব ঘটানো কি সম্ভব? অন্য কথায়, তিউনিসিয়ায় যে-দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ঘটেছে অন্য রাষ্ট্রে কি তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে? একজন যুবক আত্মাহুতি দেবে, জনতা ফুঁসে উঠবে এবং পরিবর্তন সাধিত হবে?!

এই বিপ্লবে যা আশঙ্কাজনক ব্যাপার তা হলো যা ঘটেছে বিশৃঙ্খলভাবে, সংহত রূপ বা পরিকল্পনা ছিল না। এগুলো হলো ঘটনাচক্রে ঘটে-যাওয়া ঘটনা, যা একইসঙ্গে ঘটেছে, ফলে এই বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে..

এটা অনেক বড় সুযোগ; কিন্তু পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি না থাকলে বড় সুযোগও নষ্ট হয়!

এটা কি কুডাক ডাকা?!

না, আমি কিছুতেই কুডাক ডাকছি না..

কিন্তু এটাই বাস্তবিকতা...আমি মনে করি, যন্ত্রণাদায়ক বাস্তবিকতায় বসবাস দিবাস্বপ্নে বসবাসের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে উত্তম।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার কিছু নীতি রয়েছে, সেগুলোর ব্যতিক্রম ঘটে না এবং যেগুলো পরিবর্তিত হয় না...এসব নীতির একটি এই যে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য তাদের ওপরই অবতীর্ণ হয় যারা তাঁকে সাহায্য করে...কোনো সম্প্রদায় যদি নিজেরা নিজেদের পরিবর্তন না করে তাহলে আল্লাহ তাদের অবস্থা পরিবর্তন করেন না। প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা এবং হিসাব-নিকাশ ও অনুশীলন ছাড়া এই পরিবর্তন ঘটবে না।

ইসলামের বিরুদ্ধে সরকারের যুদ্ধে ফলাফল হলো মুসলমানদেরকে কারাগারে অন্তরিন করা বা বিতাড়িত করা অথবা দেশের বাইরে পালিয়ে যাওয়া। তিউনিসিয়ায় (বিন আলির শাসনামলে) অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অনেক ইসলামপন্থী কর্মী কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। প্রায় ১৯৯২ সাল থেকে একনায়কতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন হয়নি..এই দীর্ঘদিনের বন্ধ্যাত্বের ফলে জাতি বিকল্প সংহত নেতৃত্ব পায়নি। অনেকের স্বপ্নও শেষ হয়ে গেছে। আমার বাসনা ছিল এই যে, যদি এই বিপ্লব কোনো নারীর হিজাব কেড়ে নেওয়ার ফলে ঘটত, যদি আত্মাহুতি-দেওয়া যুবকের কারণে না ঘটত!

আমার সম্মানিত পাঠকেরা, আপনারা আমার প্রতি ক্ষুব্ধ হবেন না!

আমি এ-কথা মুসলিম উম্মাহর প্রতি ভালোবাসার কারণেই বলেছি, যারা এক বিরাট বিভ্রমে বসবাস করছে!

অনেকেই বেরিয়েছে এবং অনেকেই বের হবে—নিজেদের শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য; এই আশায় যে, এতে পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু কিছুতেই পরিবর্তন ঘটবে না, যদিও গোটা জাতির সবাই নিজেকে জ্বালিয়ে দেয়!

হতাশাগ্রস্তরা কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না..

এই অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত এলোমেলো পরিবর্তন একটি সহজ ফল এবং উম্মাহর শত্রুদের হাতে সহজলভ্য..।

স্বয়ং সাবেক সরকারের একজন লোক নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করবে এবং বলবেঃ 'আমরা অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে এবং অচিরেই আমরা শুদ্ধিমূলক বিপ্লব ঘটাব।' একটি বড় সংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং ওই নেতা তাদের কুরবানি দিয়ে দেবেন। অথচ কিছুদিন আগেও তারা ছিল

তাঁর বন্ধু। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের মধ্য থেকে একদলকে মনোনীত করা হবে, যাদের কোনো মূল্য নেই। জাতিকে এনেসথেসিয়া অচেতন করে দেওয়া হবে; সেই সঙ্গে আশা দেওয়া হবে, ভয়ও দেখানো হবে। তিউনিসিয়ার শহুরে সমাজ নতুন সরকারকে আশীর্বাদ জানাবে। আমেরিকা অভিনন্দন জানাবে, ফ্রান্স অভিনন্দন জানাবে। আরবের প্রচারসংস্থাগুলো নবপরিবর্তনের প্রশংসায় প্রতিযোগিতা করবে। নতুন বিজয়ী নেতাকে দুনিয়াজুড়ে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। আমরা যদি এই নেতার চেহারা থেকে মুখোশটি সরিয়ে নিই, তবে যাইনুল আবেদিনই প্রকাশ পাবে!!

আমি কেন এই কথা বলছি?!

এটা হতাশ হওয়ার আহ্বান নয়; বরং তা কাজ ও তৎপরতার আহ্বান..

প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার বিকল্প নেই..

অনেকগুলো শক্তিকে অবশ্যই দৃশ্যমান থাকতে হবে, এমনকি কারাগার, নির্যাতন, হুমকি-ধমকি-পীড়নের বিনিময়ে হলেও..।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিতে অব্যাহতভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং জাতির সমস্যা-সংকটে তাদের অংশীদার হতে হবে। দিন-রাত বিকল্প সমাধানগুলো ছুড়ে ফেলতে হবে। যখন এ-রকম একটি সুবর্ণ সুযোগ চলে আসবে তখন সংশোধনপন্থীরাই জাতির সামনে স্বাভাবিক ও যৌক্তিক বিকল্প নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবেন..।

তিউনিসিয়ায় এখন সবাই ক্ষমতা চাচ্ছেন। এখান থেকে ওখান থেকে ভালো ভালো ইসলামপন্থী নেতা নিজেদের উপস্থাপিত করবেন...তখন জাতি বলবে, যখন আমরা বিপ্লব ঘটালাম তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? অনেকেই ক্ষমতা নিয়ে গোলমাল ও হাঙ্গামা বাঁধাবে, নানাজনের নানা কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হবে। তখন একজন রহস্যময় ব্যক্তির উত্থান ঘটবে, যিনি আমেরিকা বা ফ্রান্সের ইশারায় যাইনুল আবেদিনকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন...।

যিনি ইতিহাস পাঠ করবেন তিনি যা ঘটেছে তার সবকিছু অনুধাবন করতে পারবেন!

আপনারা কামাল আতাতুর্ক কীভাবে তুরস্কের ক্ষমতার মসনদে সমাসীন হয়েছিলেন তার ইতিহাস পাঠ করুন..।

ইতিপূর্বে দ্বিতীয় পয়েন্টে আমরা বলেছি, পরিবর্তন এমনভাবে ঘটে যে আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। আমরা মক্কা বিজয়ের উদাহরণ উল্লেখ করেছি। বনু খুযাআর সঙ্গে বনু বকরের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি হিসেবে মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটে। এ-ব্যাপারটি কারও ধারণায়ও আসেনি। কুরাইশ কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা চাইলেন এমন একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটবে, যাতে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (আমাদের ও তাঁদের মধ্যে) উপাদানগত পার্থক্য এই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গে সকল সাহাবি চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন...তাঁর ঈমান ও বিশ্বাসের দিক থেকে প্রস্তুত ছিলেন; সামরিক, অর্থনৈতিক ও পরিকল্পনার দিক থেকেও প্রস্তুত ছিলেন। যখন অপ্রত্যাশিতভাবে একটি বড় সুযোগ এসে গেল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন, ফলে তিনি দীর্ঘ প্রস্তুতির ফসল ঘরে তুললেন।

আমরা জানি না কখন আমাদের অনুকূল সুযোগ চলে আসবে; কিন্তু আমরা এমন সুযোগের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়। আমরা জানি না কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে; কিন্তু আমরা জানি কীভাবে আল্লাহর সাহায্যের হকদার হব!

উপর্যুক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে বলা যায়, অন্যান্য দেশে তিউনিসিয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটা অসম্ভব প্রায়..; বরং আমরা কামনাও করি না এই পন্থায় এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটুক। আমরা তো চাই ভালো প্রস্তুতি ও সুন্দর পরিকল্পনা এবং প্রচুর পরিশ্রম ও প্রভূত কুরবানির পর এমন ঘটনা ঘটুক। এ-ধরনের প্রস্তুতির পর এমন সুযোগ এলে সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হবে। যারা সুযোগের ফসল ঘরে তুলতে পারে তারাই এর থেকে উপকার লাভের সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত।

নবম পয়েন্ট :

আমরা যখন ইতিহাসের পাতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব তখনই আমরা ঘটনাবলির গভীর বিশ্লেষণ করতে পারব। দুই লাইনের মাঝে কী আছে (ঘটনার রহস্য ও কার্যকারণ কী) তাও দেখতে পাব। কিন্তু তার চেয়েও

সঙ্গত, উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সব বিষয়কে সব সময় শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা..।

অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, আমরা কোনো বিষয়কে ভালো বলি, অথচ শরিয়তের দৃষ্টিতে তা নিকৃষ্ট। আমরা কারও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি যে, সে প্রজ্ঞাবান, অথচ শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সে নির্বোধ। অবস্থা এইরকম হলে, সন্দেহ নেই যে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয় অর্থহীন ও ঠুনকো, যার কোনো মূল্য নেই।

আপনারা আমাকে এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে দুটি মাসআলা বর্ণনা করার সুযোগ দিন।

এ-দুটি মাসআলা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে..।

প্রথম মাসআলা : আত্মাহুতি-দেওয়া যুবকটির ঘটনা, যা শুরুতেই ঘটেছে..

মুসলমানদের জন্য কখনো—যাইনুল আবেদিন বিন আলির দুঃশাসনের অবসানের ফলে অতি উৎসাহ ও রাজনৈতিক আবেগের বশবর্তী হয়েও এই যুবককে শহিদ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। বরং অনেকেই তো তার একটি বা একটি মূর্তি স্থাপনের দাবি জানিয়েছে!

নিশ্চয় যুবকটি শরিয়তের হুকুম অনুযায়ী—একটি ঘৃণ্য অপরাধ করেছে। তা হলো আত্মহত্যার অপরাধ। এই বিষয়ে কখনো আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত নয়। আমরা এ-ব্যাপারে যৌক্তিক কারণগুলো আলোচনা করব...আমাকে উচ্চৈঃস্বরে বলতে দিন : "কিছুতেই আত্মহত্যামূলক অপরাধের বৈধতাদানকারী কারণ থাকতে পারে না, পরিস্থিতি যতই নাজুক ও দুর্দশাপূর্ণ হোক না কেন।" বরং তা দুর্বল ঈমানের চরম দশা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾

"আপন প্রতিপালকের রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ব্যতীত কেউ নিরাশ হয় না।"[১৬২]

---

[১৬২] সুরা হিজর : আয়াত ৫৬।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন—

﴿وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

"আল্লাহর আশিস থেকে নিরাশ হয়ো না; কারণ, আল্লাহর আশিস হতে কেউ নিরাশ হয় না, কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত।"[১৬৩]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾

"তোমার নিজেদের হত্যা করো না।"[১৬৪]

যে-ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে সে এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের জবাবদিহি দাঁড় করাতে পারবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় এমন কর্মের মন্দত্ব ও অশুভ পরিণাম বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেছেন—

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

"যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের ওপর থেকে নিক্ষেপ করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে যাবে। সেখানে সে অনন্তকাল ধরে সর্বদা নিজেকে ওইভাবে নিক্ষেপ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, সে-বিষ তার হাতে থাকবে। জাহান্নামে অনন্তকাল ধরে সর্বদা সে ওইভাবে নিজেকে বিষ পান করিয়ে মারতে থাকবে। যেকোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করেছে

---

[১৬৩] সুরা ইউসুফ : আয়াত ৮৭।

[১৬৪] সুরা নিসা : আয়াত ২৯।

> জাহান্নামে তার কাছে ওই ধারালো অস্ত্র থাকবে যার দ্বারা সে সর্বদা নিজের পেট ফুঁড়তে থাকবে।"[১৬৫]

আপনারা হাদিসের বাক্যগুলো দেখুন, তাহলে নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা ও আত্মহত্যার নিকৃষ্টতা উপলব্ধি করতে পারবেন...।

প্রচারমাধ্যম যখন শরিয়তের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে পাত্তা দিল তখন কী ঘটল? কী ঘটল যখন সবাই ধারণা করে নিল যে, এই আত্মহত্যাকারী যুবক একজন শহিদ?

মুসলমানরা ধারণা করেছে যে এটা একটি প্রশংসনীয় কাজ এবং তা একটি মর্যাদাপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করবে। বরং অনেকেই ধারণা করেছে যে, এতে অনেক পুণ্য রয়েছে এবং এর জন্য জান্নাতে উঁচুস্তরের মর্যাদা লাভ হবে! হ্যাঁ, মিসরে এখন পর্যন্ত সাতজন নিজেকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। আলজেরিয়ায় নিজের গায়ে আগুন জ্বালিয়েছে চারজন। মৌরিতানিয়ায় নিজেকে আগুনে পুড়িয়েছে একজন...এটা হলো আমি যতটুকু জেনেছি..এরা ছাড়াও আরও অনেকে রয়েছে যাদের আত্মহত্যার সংবাদ প্রচারমাধ্যমে গুরুত্ব পায়নি। নিশ্চয় এভাবে আত্মহত্যার ঘটনা ভয়াবহ দুর্যোগ...

এসব কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে শরিয়ত-বিরোধী...নেতিবাচক ঘৃণ্য কাজ...এগুলো হলো দুনিয়ার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথে গমন!!

তিউনিসিয়ার যুবকটি যে-দুর্দশা ও দুর্ভোগ ভোগ করেছে তার চেয়ে বহু বহুগুণ বেশি দুর্ভোগ ও দুর্দশা ভোগ করেছেন স্বয়ং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। তাঁদের কেউই আত্মহত্যা করেননি। বিধর্মীরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেহারায় থুথু দিয়েছে, তাঁর মাথার ওপর ময়লা-আবর্জনা ঢেলে দিয়েছে, তাঁকে নিকৃষ্ট গালি-গালাজ করেছে, তাঁর গায়ে পাথর

---

[১৬৫] সহিহ বুখারি, কিতাব : আত-তিব্ব, বাব : শুরবুস সাম্মি ওয়াদ দাওয়ায়ি বিহি ওয়া বিমা ইয়াখাফু মিনহু ওয়াল খাবিসি, হাদিস নং ৫৪৪২; সহিহ মুসলিম, কিতাব : আল-ঈমান, বাব : গিলাযু তাহরিমি কাতলিল ইনসান ওয়া ইন্না মান কাতালা নাফসাহু বি-শাইয়িন উযযিবা বিহি ফি.., হাদিস নং ১০৯।

নিক্ষেপ করেছে, তাঁকে ঘর থেকে বিতাড়িত করেছে, তাঁর সম্পদ জব্দ করেছে; তাঁর সাহাবিদের সঙ্গেও একই কাজ করেছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিউনিসিয়ার যুবকটির ওপর যে-ব্যক্তি জুলুম করেছে (চড় মেরেছে ও টানা গাড়ি ভেঙে দিয়েছে) সে একজন মহিলা পুলিশ। ফলে যুবকটির আত্মমর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ন হয়েছে। আমি আপনাদের বলব, সম্মানিত অভিজাত আরব খাব্বাব বিন আল-আরাত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নিকৃষ্ট শাস্তি দিয়েছিলেন একজন মহিলা। কিন্তু তাঁকে আত্মহত্যা করার বা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

তিউনিসিয়ার আত্মহত্যাকারী যুবক যে-সম্মান লাভ করেছে তা আমি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করি (আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়), যদিও তার ঘটনায় সূচিত বিপ্লব সফল হয়েছে। মক্কা বিজয়ও সফল হয়েছিল, অথচ এর মূল কারণ ছিল বনু খুযাআর সঙ্গে বনু বকরের বিশ্বাসঘাতকতা। এর অর্থ এই নয় যে, আমাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশংসা করতে হবে অথবা বিশ্বাসঘাতকদের গুণগান গাইতে হবে..। মূল ব্যাপার হলো, আমাদের উদ্দেশ্যসমূহকে শরিয়তের হুকুম-আহকামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা এবং আমাদের উপায়-উপকরণও শরিয়তের বিধান মোতাবেক প্রস্তুত করা। আমরা যখন এভাবে কাজ করতে সমর্থ হব তখনই পরিবর্তন আসবে। তখনই সাময়িক বা কল্পিত নয়, বরং প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হবে।

দ্বিতীয় মাসআলা : আমি এ-বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে সম্মানিত আলেম-উলামাকে আহ্বান জানাই। বিষয়টি হলো, সৌদি আরব কর্তৃক যাইনুল আবেদিন বিন আলিকে আতিথ্য প্রদান!

সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির সাউদ আল-ফয়সাল স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, 'অতিথিসেবা আরবদের একটি প্রাচীন প্রথা এবং যে-ব্যক্তি আশ্রয় প্রার্থনা করে তাকে আশ্রয় দিতে হয়।'[১৬৬]

প্রশ্ন এই যে, সৌদি আরবে যে-সকল সম্মানিত আলেম রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে কি এ-বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাঁদের মতামত নেওয়া

---

[১৬৬] وكالة الأنباء السعودية (واس)/Saudi Press Agency, বুধবার, ১৯ শে জানুয়ারি, ২০১১।

হয়েছে? না-কি এমনিতেই কাজটি করে ফেলা হয়েছে যে, পরবর্তী সময়ে আলেমগণ এ-কাজটির বৈধতার ব্যাপারে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন?

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সিদ্ধান্তসমূহ থেকে ধর্মীয় নীতি ও বোধের দূরীকরণ মুসলমানদেরকে সবচেয়ে বেশি বিপর্যয়গ্রস্ত করে..

শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে উপর্যুক্ত কাজটির পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যক..

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا.

"যে-ব্যক্তি কোনো ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় আল্লাহ তাআলা তাকে অভিসম্পাত করেন।"[১৬৭]

ইমাম নববি সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, 'মুহদিস শব্দের অর্থ হলো যে-ব্যক্তি জমিনে ফ্যাসাদ ও অরাজকতা সৃষ্টি করে।'[১৬৮]

যাইনুল আবেদিন বিন আলি জমিনে অনেক অনেক বেশি ফ্যাসাদ ও অরাজকতা সৃষ্টি করেছেন। শরিয়তকে ইতর ও অনর্থক বলা এবং প্রত্যক্ষভাবে শরিয়তের বিধান পরিবর্তনের চেয়ে বড় ফ্যাসাদ আর কী আছে? এটা ছাড়াও তিনি তাঁর দেশে বহু ধরনের ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছেন।

তারপর প্রশ্ন এই যে, যে-লোকটি ও তার পরিবার তিউনিসিয়ার বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে এবং ব্যক্তিগত হিসাবে (অ্যাকাউন্টে) জমা করেছে তাকে কি আশ্রয় দেওয়া যেতে পারে? তাকে কি নিরাপত্তা দেওয়া বৈধ হবে, যাতে সে এসব লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে? এমন লোককে কি আশ্রয় দেওয়া বৈধ আছে যে মুসলমানদের রক্তপাত ঘটিয়েছে, যার ওপর ডজন ডজন, শত শত ও হাজার হাজার দণ্ড?

---

[১৬৭] সহিহ মুসলিম, কিতাব : আল-আদাহি, হাদিস নং ১৯৭৮; সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ৪৫১১; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৮৫৫।

[১৬৮] নববি, আল-মিনহাজ, ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১।

এই জালিম, সীমালঙ্ঘনকারী ও অরাজকতা সৃষ্টিকারীর প্রতি ঝুঁকে পড়া (আদর-সোহাগ দেওয়া) কি জায়েজ হবে, যখন আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾

"যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, তাহলে (জাহান্নামের) আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে। এই অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং তোমাদের সাহায্য করা হবে না।"[১৬৯]?

যাইনুল আবেদিনের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে আশঙ্কা করা কি বৈধ হবে, অথচ দশ মিলিয়ন তিউনিসীয় মানুষের আবেগ-অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হবে না? বরং বিলিয়নেরও বেশি মুসলমানের আবেগ-অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে না যারা এই স্বৈরাচারীকে ঘৃণা করে?

নিশ্চয় সৌদি আরব একটি মহান ইসলামি দেশ। বরং প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে এ-দেশটির জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান সুরক্ষিত রয়েছে। কারণ, দেশটির বুকে রয়েছে পবিত্র কা'বা এবং এ-দেশটি ধারণ করে আছে সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ যিনি সেই নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দেহ। শ্রেষ্ঠ মানবমণ্ডলী সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর শত শত অমলিন স্মৃতিবিজড়িত এই দেশ। এই সীমালঙ্ঘনকারী জালিমের প্রতি কৌশলে (কূটনৈতিকভাবে) আপত্তি জানানো যেত; সৌদি আরব মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতিকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না, যারা সৌদি আরবকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে এবং অন্য যেকোনো দেশ থেকে এগিয়ে রাখে..।

সে যেন ফ্রান্সে অথবা আমেরিকায় চলে যায়...তার সমাপ্তি যেন সেখানেই ঘটে যেখানে তার সূচনা ঘটেছে। মক্কা মুকাররমা ও মদিনা মুনাওয়ারা যেন এই নাপাকি ও আপদ থেকে পবিত্র থাকে।

---

[১৬৯] সুরা হুদ : আয়াত ১১৩।

Contents

এটা আমার একটি আহ্বান; আমি সৌদি আরবের শাসকবৃন্দ ও উলামায়ে কেরামকে এই আহ্বান জানাতে চাই। আশা করা যায়, আমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং আমাদের ওপর তাঁর অসন্তুষ্টি ও অভিসম্পাত বর্ষণ করবেন না।

দশম পয়েন্ট :

হে তিউনিসিয়ার সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ...

> আপনাদের জন্য আমার হৃদয়ে আপনারা যতটুকু ধারণা করেন তার চেয়ে বেশি ভালোবাসা রয়েছে...আমার হৃদয় আনন্দে লাফিয়ে ওঠে যখন আমি পাশ্চাত্যে বা প্রাচ্যে কোনো মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁর দেশ কোথায় জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিউনিসিয়া। আপনাদের জন্য আমার ভালোবাসা অনেক পুরোনো, অনেক প্রাচীন...এই ভালোবাসা কয়েকটি শতাব্দী দীর্ঘায়ু পাবে! তিউনিসিয়া একটি মহান দেশ। দেশটির রয়েছে সম্মানজনক ইতিহাস। তিউনিসীয়রা অভিজাত জাতি। কেবল মুসলমানদের কল্যাণে নয়; বরং গোটা দুনিয়ার কল্যাণে তাদের রয়েছে বিশাল অবদান... আপনাদের দ্বারা সিসিলি বিজিত হয়েছে। ওখান থেকে মুসলমানরা ইউরোপে পৌঁছেছে। তার আগে স্পেন বিজয়ে আপনারা অবদান রেখেছেন। ওখান থেকে গোটা দুনিয়ায় কল্যাণ ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা ইফ্রিকিয়ায় (আফ্রিকায়) আপনারাই ছিলেন মুসলমানদের অগ্রদূত ও নেতা..।
>
> আল্লাহর ওয়াস্তেই আপনাদের আমি ভালোবাসি...আপনাদের প্রতি আমার ভালোবাসা আমার অস্তিত্বজুড়ে এবং তা আমার অস্তিত্বকে আন্দোলিত করে...
>
> "আমি একজন তিউনিসীয়"—এটি এমন কথা যা আমাকে উৎসাহিত করে, সৌভাগ্যমণ্ডিত করে...
>
> আমার মনে হয় আমি একটি পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি...তিউনিসিয়ার কোনো নারী বা কোনো পুরুষ...দমন-পীড়ন সত্ত্বেও দ্বীনের ওপর রয়েছে অবিচলতা...যুদ্ধ-লড়াই সত্ত্বেও ইসলামের জন্য প্রগাঢ় ভালোবাসা...বিকৃতি ও মিথ্যার বেসাতি

সত্ত্বেও শরিয়তকে আঁকড়ে ধরে থাকা...পাশ্চাত্যকরণ সত্ত্বেও ইসলামি ও দেশীয় পরিচিতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করা..

হে তিউনিসিয়ার প্রিয় বাসিন্দাগণ!

আপনাদের প্রতি আমার ভালোবাসা ও আপনাদের ওপর আমার আশঙ্কা থেকে আমি বলি...কোনোকিছুকে ইসলামের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করবেন না!

পশ্চিমা বিশ্ব, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা, সমাজতন্ত্রীরা, লিবারেলিস্টরা আপনাদের সামনে হাজারো বিকল্প ব্যবস্থা ও গবেষণাপত্র ছুড়ে দেবে; আপনারা ইসলামের বদলে কোনো বিকল্পে সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন না..

আপনার দ্বীন আপনার দেহ আপনার রক্ত!

আপনাদের এই মনোনয়ন (ইসলামকে বিকল্পহীনরূপে মনোনীত করা)-এর ফলে অনেক যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ আসবে...বরং ক্ষমা করুন...অবশ্যই অনিবার্যভাবে—অনেক যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ আসবে!

কিন্তু এসব দুর্দশা ও দুর্ভোগ আল্লাহর পথে, সুতরাং তা কত উত্তম! তা আল্লাহর পথে জিহাদ, সুতরাং তা কত শ্রেষ্ঠ! এবং পরিণতিতে তা দুনিয়ার সম্মান ও আখেরাতের সম্মান... আমরা এমন জাতি, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ইসলামে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আমরা ইসলাম ব্যতীত অন্যকোনো পন্থায় যদি সম্মান খুঁজি তাহলে আল্লাহ আমাদের অপদস্থ করবেন..

আপনাদের সামনে আজ রয়েছে মহান সুযোগ, সুতরাং তা নষ্ট করবেন না..

হে তিউনিসিয়ার মানুষসকল, আমার থেকে শুনুন :

> "এখন এই বিপ্লবের ওপর অটল থাকা দুই বছর বা দশ বছর পর নতুন একটি বিপ্লব ঘটানোর চেয়ে হাজার গুণ সহজ।"

আজ আপনাদের আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা অনেক উঁচু...মুসলমানদের সকল হৃদয় আপনাদের সঙ্গে রয়েছে...আপনাদের

ত্যাগ-তিতিক্ষা অনেক সহজ...আপনাদের শত্রু দুর্বল...আপনাদের ঘৃণিত ব্যক্তিরা নিশ্চুপ...এটাই সুযোগ..

আপনারা যদি আপনাদের বিপ্লবের ওপর অটল থাকেন—যতক্ষণ না এমন একজন মুসলিম আপনাদের নেতা হন যিনি আল্লাহকে ভয় করেন ও তাকওয়া অবলম্বন করেন, শরিয়তের হুকুম-আহকামের প্রতি উদ্গ্রীব থাকেন ও শরিয়তকে ভালোবাসেন, প্রতি পদক্ষেপে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করেন—তাহলে অগ্রগামিতার মর্যাদা আপনারা পাবেন, নেতৃত্বের সম্মান আপনারা লাভ করবেন, আপনাদের অভিজ্ঞতা প্রদান করতে পারবেন তৃষ্ণার্ত উম্মাহকে, যারা ইসলামের দ্বারা তাদের তৃষ্ণা নিবারণে আগ্রহী...।

আপনারা যদি তাড়াহুড়ো করেন এবং আপনাদের দেহকে বিশ্বাস দেন তাহলে তাদের কেউ-না-কেউ আপনাদের বিপ্লব চুরি করে নিয়ে যাবে, আপনাদের ফল তারা ভোগ করবে। পশ্চিমাদের লেজুড়বৃত্তিপরায়ণ কেউ, অথবা কোনো কমিউনিস্ট বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আপনাদের দেশের লাগাম ধরবে। এতে, আমি মনে করি, বড় ধরনের বিপত্তি ঘটবে। এই বিপত্তি গোটা উম্মাহর শরীরে হতাশা ঘা তৈরি করবে...।

আপনাদের দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহকে, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করুন...

মুসলিম উম্মাহর ব্যাপারে আল্লাহকে, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করুন...

আপনাদের নিজেদের ও পরিবারের ব্যাপারে আল্লাহকে, একমাত্র আল্লাহকে ভয় করুন...আপনারা দুনিয়ার বুকে কাজ করুন, আপনাদের চোখ থাকুক আখেরাতের দিকে...পরিণতিতে, চিরস্থায়ী জান্নাত অথবা চিরস্থায়ী জাহান্নাম...

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান বৃদ্ধি করুন।

Contents

পরিসমাপ্তি

এটাই তিউনিসিয়ার কাহিনি... ২০১১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত...

এই কাহিনিতে জড়িয়ে আছে মুসলিম উম্মাহর আবেগ-অনুভূতি, তাদের আনন্দ-বেদনা ও সৌভাগ্য...

বেদনা এই জন্য, তিউনিসিয়াকে অনেক যন্ত্রণা, দুর্দশা ও দুর্ভোগ পেরিয়ে আসতে হয়েছে এবং তা এমন লোকদের হাতে যারা এই দেশেরই মানুষ। আনন্দ এই জন্য, ষড়যন্ত্রকারীদের হাজারো ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিউনিসিয়ায় এখনো ইসলাম টিকে আছে...

সৌভাগ্য এই জন্য যে, তিউনিসীয় জাতি জেগে উঠেছে এবং স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ও বিপ্লব ঘটিয়েছে। দুঃখ এই জন্য যে, এ-অভ্যুত্থানও বিপ্লবের জন্য ইসলামি ভাবধারা ঠিক স্পষ্ট নয়; এ-কারণে, একটি নিকৃষ্ট অবস্থা থেকে তিউনিসিয়ার রূপান্তর ঘটবে এমন এক অবস্থায় যা পূর্বের চেয়ে ততটা ভালো নয়।

তারপরও, আমি চূড়ান্ত আশাবাদী...

এই বিপ্লব চুরি হয়ে গেলেও আমি আশাবাদী...

আমেরিকা ও ফ্রান্স এতে নাক গলালেও আমি আশাবাদী...

জাতি স্বাধীনতার স্বাদ 'আস্বাদন' করেছে, কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও...। যে-ব্যক্তি আস্বাদন করে সে চেনে। যে-ব্যক্তি চেনে সে পরিচিত বস্তুর প্রতি আরও উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে, কিছুতেই তিউনিসীয় জাতির প্রেরণা দমে যাবে না, যতক্ষণ না তারা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূল পয়েন্ট এই যে, তিউনিসিয়ার জনমণ্ডলীকে বুঝতে হবে যে, দেশটির শেষ এক শ বছরের ইতিহাসে তারা যে-বিপুল বিপর্যয় ও দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে গিয়েছে তার কারণ হলো মানুষের জীবন থেকে ইসলামের প্রকৃত অনুপস্থিতি। ইসলাম কেবল নামাজ ও রোজা নয়; বরং

কেবল হিজাব ও পোশাকও নয়.. তাহলো জীবনপদ্ধতি... তা রাজনীতি ও অর্থনীতি.... লেনদেন ও অধিকার...তা উম্মাহর বরং গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব।

যে এই সত্য অনুধাবন করতে পারবে সে দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান হবে..

এবং যে তা অবহেলা করবে তার অনুশোচনা ও ব্যর্থতার শেষ থাকবে না..!!

সে গোটা দুনিয়ার সকল সম্পত্তির অধিকারী হলেও সঙ্কীর্ণ জীবনযাপন করবে এবং তার জন্য আখেরাতে রয়েছে ভীষণ আজাব!

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তিউনিসীয় জাতিকে সরল পথে পরিচালিত করুন। তারা যেন বুঝতে পারে, এই উম্মাহর শুরুর অবস্থা যা-কিছুর দ্বারা শুদ্ধ ও সঠিক ছিল, শেষের অবস্থাও তার দ্বারাই শুদ্ধ ও সঠিক থাকবে।

ইতিহাসে অনেক শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ তাআলাই তাওফিকদাতা এবং তিনি পথপ্রদর্শন করেন..

আমি আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান বাড়িয়ে দিন; তিউনিসিয়া ও তার বাসিন্দাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিন; মুসলমানদের সকল দেশের মর্যাদা বাড়িয়ে দিন।

—ড. রাগিব সারজানি

২১ শে জানুয়ারি, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।

বাংলায় অনূদিত ড. রাগিব সারজানি'র আরও কিছু বই

বই	মুদ্রিত মূল্য
০১ . আন্দালুসের ইতিহাস (দুই খণ্ড)	১২০০/-
০২. তাতারীদের ইতিহাস	৪৪০/-
০৩. শোনো হে যুবক	১২০/-
০৪. পড়তে ভালোবাসি	৬০/-
০৫. আমরা সেই জাতি	১২০/-
০৬. এটাই হয়তো জীবনের শেষ রমযান	১৩০/-
০৭. ফজর আর করব না কাযা	৩২০/-
০৮. হজ—যে শিক্ষা সবার জন্য	১২০/-
০৯. কেমন ছিল প্রিয়নবীর আলাপচারিতা	১৬০/-
১০. আমরা আবরাহার যুগে নই	১২০/-
১১. কে হবে রাসুলের সহযোগী	১২০/-

ড. রাগিব সারজানি এ-বইতে তিউনিসিয়ার প্রাথমিক ইতিহাস থেকে শুরু করে ২০১১ সালের অভ্যুত্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। তিউনিসিয়া ইসলামি শাসনের ছায়াতলে আসার পর উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। একসময় উসমানি সাম্রাজ্যের অধীনতায় চলে যায়। তারপর দেশটিতে ফ্রান্সের দখলদারত্ব শুরু হয়। দখলদারদের শাসনামলে দেশ থেকে ইসলামকে বিলুপ্ত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা ব্যয় করা হয়। বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থা ও ইসলামি নিদর্শনগুলোর ওপর আঘাত হানা হয়। ফরাসি দখলদারত্বের সমাপ্তি ঘটলে প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা দেওয়া হয়। এরপর ২০১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে মাত্র দুইজন ব্যক্তি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চালিয়ে যান। অবশেষে ২০১১ সালের অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। লেখক এ-বইতে এসব ঘটনার চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন।

B0004

ISBN

9 789848 012154

মাকতাবাতুল হাসান